

## হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদীনা জীবন

### ভূমিকা

হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আগমনের পর তাঁর মদীনা জীবন শুরু হয়। তাঁর মদীনা জীবন অত্যন্ত ঘটনা বহুল। মক্কায় থাকাকালীন সময়ে তিনি শুধুমাত্র ধর্ম প্রচারকের ভূমিকায় ছিলেন। আর মদিনায় এসে তিনি রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদা লাভ করেন। ফলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার সুযোগ পান। ইসলামের সামাজিক ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে তিনি একাধারে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সংস্কার, অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও নতুন সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন। সাথে সাথে ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-তাঁর জীবনের মাত্র দশ বছর মদিনায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময়েই ইসলামের অধিকাংশ বিধান অবতীর্ণ হয়। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে তাঁকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে অনেকগুলো সশস্ত্র যুদ্ধ করতে হয়েছে। তিনি ইসলামি আদর্শকে আরবের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি বিশ্ব মানবতার কাছে একটি চিরন্তন কালজয়ী জীবন ব্যবস্থা ও আদর্শ সমাজ কাঠামো উপহার দেন, যা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। তাঁর জীবনের বিস্ময়কর সফলতা এখানেই।

এ ইউনিটে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদীনা জীবনের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।



### হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রাথমিক কার্যাবলী



#### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রাথমিক কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদীনা জীবনের প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

### প্রাথমিক কার্যাবলী



হিজরতের পর হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর শিষ্যদেরকে মদিনাবাসীগণ সাদরে গ্রহণ করেন। মদিনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসবির। মহানবীর (স) সম্মানে ইয়াসরিববাসী এর নাম পরিবর্তন করে 'মদিনাতুন্ নবী' বা 'নবীর শহর' সংক্ষেপে মদীনা রাখেন। মদিনায় মহানবীর (স) সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় মুহাজিরদের পুনর্বাসন নিয়ে। যে সব সাহাবী জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে হযরতের সঙ্গে মদিনায় চলে এসেছিলেন তাঁদেরকে 'মুহাজিরীন' বলা হয়। মহানবীর (স) প্রতি তাঁদের অপারিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ছিল। তাঁরা ইসলামের জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ি, অীশ্ব-স্বজন, বিষয়-সম্পদ সব কিছু ছেড়ে এসে নিঃশ্ব অবস্থায় মদিনায় আশ্রয় নেন। প্রিয় নবী (স) তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এভাবে করেন-

(ক) মদিনাবাসী আনসারদের সাথে মক্কার মুহাজিরদের মধ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

(খ) আনসারগণ মুহাজিরদেরকে ভাই বলে গ্রহণ করেন এবং নিজেদের ধন-সম্পদে মুহাজির ভাইকে অংশ দেন। মদিনাবাসী মুসলিমগণ মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্ত মুহাজিরীন ভাইদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, দৃংখ দুর্দশায় সাহায্য করেছিলেন এবং মহানবী (স) কে সকল অবস্থায় সাহায্য করেছিলেন। এজন্য তাঁদেরকে 'আনসার (helpers), বা

‘সাহায্যকারী’ বলা হয়। এ আনসারদের সহায়তা না পেলে ইসলাম মদিনায় এবং সারা বিশ্বে হয়ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত না। ধর্মভাইদের প্রতি এরূপ আত্মগোপন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না।

### মসজিদ নির্মাণ

মহানবী (স) বনু নাজ্জার গোত্রের সাহল ও সুহাইল দু’জন ইয়াতীম বালকের এক খণ্ড জমি ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করেন। হযরত নিজেও নির্মাণ কার্বে অন্যান্যদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। মসজিদের দেয়াল তৈরি হয়েছিল ইট ও মাটি দিয়ে এবং ছাউনি দেয়া হয়েছিল খেজুর পাতার। এটাই ‘মসজিদুনবী’ বা নবীর মসজিদ। এখানে বসেই মহানবী (স) ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় সকল কাজ করতেন। কালক্রমে এটাই ইসলামের প্রধান মিলন কেন্দ্র হিসেবে পরিণত হয়। এ মসজিদের সাথেই তাঁর পরিবারবর্গের বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। সাহাবীদের মধ্যে এদেরকে ‘আসহাবুস-সুফফা’ বা ‘চতুরবাসী’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হত। যাদের ঘরবাড়ি ছিল না তাদের বসবাসের জন্য মসজিদের একাংশ আলাদা করা হয়েছিল।



মসজিদে নববী, মদীনা, পাকিস্তান

মসজিদে নববীঃ মহানবী (সঃ)-এর জীবনের শেষ দশটি বছরের অধিকাংশ সময় এখানেই তিনি অতিবাহিত করেন। এবং কেয়ামত পর্যন্ত জীবনের শেষ বিশ্রামস্থল হিসেবে একেই মনোনীত করেন।

চিত্র- ৭ঃ মদিনায় অবস্থিত নবী করিম (স)-এর মসজিদ

### আদি পৌত্তলিক

মদিনার আদি অধিবাসীদের মধ্যে একদল মূর্তি উপাসক পৌত্তলিক ও ছিল। মহানবীর (স) আগমনে তারাও প্রথমে খুশি হয়েছিল এবং তাঁকে রক্ষা করার জন্য সংঘবদ্ধ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইসলামের শক্তির একক উত্থান ও বিকাশে পৌত্তলিকরা ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছিল। তবে এরা সময়ের ব্যবধানে ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়েছিল।

### ইহুদি

ইহুদি সম্প্রদায় মদীনাতে বেশ শক্তিশালী ছিল। তারা তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল। যথা- বনু কুরাইয়া, বনু কাইনুকা এবং বনু নাযির। ইহুদিরা ছিল অত্যন্ত স্বার্থপর ও সীমাহীন দূর্বৃত্ত। তারা ঘৃণ্য সুদ ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। মুহাম্মদ (স) নবুয়ত প্রাপ্তির পর ইহুদিরা তাকে তাদের ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত “প্রতিশ্রুত নবী” হিসেবে গ্রহণ করে। মুহাম্মদ (স) মদীনাতে আগমন করলে তারা তাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। মুহাম্মদ (স)-এর সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের আন্তরিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা যখন দেখল যে ইসলাম ধর্মের রীতি নীতি ও আচার অনুষ্ঠান তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হচ্ছে তখন তারা মুহাম্মদ (স) ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে।

### খ্রিস্টান

খ্রিস্টানরা বসবাস করত নাজরান অঞ্চলে। খ্রিস্টানরাও তাদের মূলধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। তবুও এরা ইহুদীদের মত ততটা নিকৃষ্ট মানসিকতার ছিল না। মদিনার খ্রিস্টানগণও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদিনায় আগমনকে অন্যান্যদের সাথে স্বাগত জানায়। কিন্তু তারাও পরবর্তী সময়ে রাসূলের বিরোধিতা করে।

### মুনাফিক গোষ্ঠী

রাসূলের মদিনায় আগমনের পর আরো একটি নতুন উপদল সৃষ্টি হল। এরা সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এদের নেতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। হযরতের আগমনের পূর্বে সে মদিনার রাজ ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদিনায় আসার কারণে তার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এ মর্ম জ্বালায় সে রাসূলুল্লাহ (স) ও ইসলামের সাথে ঘোরতর গোপন শত্রুতা শুরু করে। তার সাথে আরো অনেকে মিলিত হয়। এরা স্বার্থ হাসিল ও জনপ্রিয়তা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু গোপনে এরা ইসলামের ভীষণ শত্রু ছিল। ইসলামের ধ্বংসের জন্য এরা নানা ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করতে থাকে। এদেরকে 'মুনাফিক' বলা হয়। এ শ্রেণীর লোকগুলো প্রকাশ্য শত্রুর চেয়ে অধিকতর ভয়ানক ছিল। হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের শত্রুতা থেকে সবসময়ে সতর্ক হয়ে চলতেন। এদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে অনেক সতর্ক বাণী এসেছে এবং এরা কাফিরদের চেয়ে নিকৃষ্টতর।

### মদিনায় বিভিন্ন দল ও গোত্রের অবস্থা

মদিনায় বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করত। মদিনার আদি অধিবাসী আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয় পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত ছিল। এদের হৃদয়ের সুযোগ নিয়ে মদিনার ইহুদীরা নিজেদের স্বার্থের জন্য তাদেরকে শোষণ করত। ইহুদীদের বনু কুরাইয়া ও বনু নাযির আউস গোত্রের পক্ষে এবং বনু কাইনুকা ছিল খায়রাজ গোত্রের পক্ষে। ইহুদীদের কূটনৈতিক শত্রুতার ফলে 'বুয়াসের' ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের ফলে উভয় গোত্রের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তারা একজন ভাল নেতার সন্ধানে ব্যস্ত ছিল। তারা হযরত মুহাম্মদ (স) কে একজন উত্তম নেতা হিসেবে পেয়ে সাদরে গ্রহণ করেন।

#### সার-সংক্ষেপ

হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনায় আগমন করে প্রথমে মসজিদ নির্মাণ ও মুহাজিরীনদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। তারপর আউস ও খায়রাজ গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ দিনের রেযারেষির মীমাংসা করেন। মদিনার সংহতির জন্য মদিনার অধিবাসীদের মন-মানসিকতা মূল্যায়ন করে অগ্রসর হতে লাগলেন।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.১

#### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

- হযরত মুহাম্মদ (স) এর সম্মানে 'ইয়াসরিব বাসী' 'ইয়াসরিব' এর নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করেন-  
ক. 'মদিনানুনবী বা মদিনা' খ. মসজিদে নববী  
গ. ইয়ামেল ঘ. মসজিদে হারাম।
- যে সব সাহাবী মক্কায় নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেশত্যাগ করে মদিনায় আশ্রয় নেন- তাঁদেরকে বলা হয়-  
ক. আনসার খ. মুহাজির  
গ. মুজাহিদ ঘ. উদ্বাস্তু
- মদিনাবাসী মুসলিমগণ মক্কা থেকে আগত উদ্বাস্তু মুহাজিরীন ভাইদের সামগ্রিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন এজন্য তাদেরকে অভিহিত করা হয়?  
ক. মুহাজির নামে খ. সাহায্যকারী নামে  
গ. আনসার নামে ঘ. মুনাফিক নামে

- ### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- પૃષ્ઠા-૧૨



## মদিনা সনদ এবং এর গুরুত্ব



### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মদিনা সনদ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন
- মদিনা সনদের প্রধান শর্তাবলী বা ধারাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- মদিনা সনদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



মহানবী (স) প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করার পর সেখানে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। মহানবী (স) মদিনার সংহতির চিন্তা করে সেখানকার অধিবাসীদের নিয়ে তথা পৌত্তলিক, ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে এক লিখিত সনদ বা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আর এ সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার ঘোষণা দেন। এ সনদকেই ‘মদিনা সনদ’ বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এ সনদের গুরুত্ব ‘লীগ অব নেশন্স’, বা ‘জাতিসংঘ’, ‘চার্টার অব ইউরোপ’ বা জেনেভা কনভেনশনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ছিল।

### মদিনা সনদের পরিচয়

হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তিনি তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা অবলোকন করলেন যে, মদিনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিমদের মধ্যে সহাবস্থান এবং সম্প্রীতি স্থাপিত না হলে একটি সুসংহত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই তিনি এ চার জাতির লোক নিয়ে একটি ‘আন্তর্জাতিক সনদ’ রচনা করেন। এ সনদের ৪৭টি ধারা ছিল। এ সনদকেই “মদিনা সনদ” বা “The charter of madina” বলা হয়।

### মদিনা সনদের ধারাসমূহ

মদিনার সনদে ৫২টি ধারা বা শর্ত ছিল। আবু ওবাইদ “কিতাব আল আমওয়াল”- এ বলেন- সামাজিক নিরাপত্তা, বিচার ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয় এবং বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হযরত মুহাম্মদ (স) এর উপর ন্যস্ত করা হয়। এ সনদ বলে হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনার সর্বাধিনায়ক ছিলেন। মদিনা সনদের প্রধান প্রধান ধারাগুলো নিম্নরূপ-

১. মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিমগণ মদিনা রাষ্ট্রে সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে এবং একটি জাতি (উম্মাহ) গঠন করবে।
২. সনদ অনুযায়ী মহানবী (স) মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং মদিনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হবেন।
৩. মদিনা রাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকবে। সকল শ্রেণীর লোক নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে।
৪. মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী কোন পক্ষ মদিনার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বহিঃশত্রুর সঙ্গে আঁতাত করতে পারবে না।
৫. সনদে স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়কে বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে সকল সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে সে বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
৬. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ বহিঃশত্রুর হামলার সময় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।
৭. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। এজন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দোষী করা চলবে না।
৮. মদিনাকে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হল এবং রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকারসহ অপরাধের অপরাধমূলক কার্যকলাপ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হল।
৯. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে এবং সর্বপ্রকার পাপী ও অপরাধীকে ঘৃণার চোখে দেখতে হবে।
১০. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কারো মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে মহানবী (স) আল্লাহর বিধানানুযায়ী তার মীমাংসা করবেন।
১১. দুর্বল ও অসহায়কে সর্বোচ্চভাবে সাহায্য ও রক্ষা করতে হবে।

১২. মহানবী (স)-এর পূর্বসম্মতি ব্যতিরেকে মদিনাবাসীগণ কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।
১৩. সনদে মক্কার কুরাইশগণকে সাধারণভাবে মদিনা রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয়। তাদেরকে বা তাদের সাহায্যকারীদেরকে সহায়তা নিষিদ্ধ করা হয়।
১৪. সনদে বলা হয় যে, প্রত্যেক গোত্র সম্মিলিতভাবে মহানবী (স)-এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে চলবে। কিন্তু স্ব স্ব গোত্রীয় দলপতিদের গোত্রীয় প্রাধান্যও অক্ষুণ্ণ থাকবে। প্রত্যেকটি গোত্র তাদের পূর্ববর্তী চুক্তিসমূহ এবং দেয় মৃত্যুপণ ও মুক্তিপণসমূহ এককভাবে প্রদান করবে। সেখানে মদিনা রাষ্ট্র কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।
১৫. সনদের শর্ত ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাতের কথা বলা হয়।

### মদিনা সনদের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাপক। যে সকল অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য মদিনা সনদকে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র বা সংবিধান বলা হয়, তা নিম্নরূপ :-

**সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান :** ইতোপূর্বে সমগ্র বিশ্বের কোথাও বিধিবদ্ধ আইনের শাসন ছিল না। শাসকদের মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল আইন। বিশ্বের ইতিহাসে মদিনার সনদই সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান।

ডঃ হামিদুল্লাহ বলেন : “মোট ৫২টি ধারাবিশিষ্ট এ সনদটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র।”

### ইসলামি সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি :

এ সনদের দ্বারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয়। রাষ্ট্র ও ধর্মের সহাবস্থানের ফলে ঐশীতন্ত্র (Theocracy) প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত মদিনা সনদই ইসলামি সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে।

### উদারতার ভিত্তিতে জাতি গঠন :

এ সনদের মাধ্যমে মহানবী (স) সকল ধর্ম ও জাতির ব্যাপারে যে উদার নীতি গ্রহণ করেন, তা বিশ্বের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পরমত ও পরধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে এ সনদ এক বৃহত্তম জাতি গঠনের পথ উন্মুক্ত করে।

### ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি :

এ সনদের ফলে মদিনা রাষ্ট্রে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মূলত এ সনদই অদূর ভবিষ্যতের বিশ্বব্যাপী ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক হিট্রি বলেন, “মদিনা রাষ্ট্রেই পরবর্তী কালের বৃহত্তম ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল স্থাপন করে।”

### মহানবীর (স) শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি :

মদিনা সনদের বদৌলতে মহানবী (স) মদিনা রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর হাতেই ছিল মদিনার চূড়ান্ত চাবিকাঠি।

### মদিনা রাষ্ট্রের সংহতি :

এ সনদ সংঘর্ষ বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন ইয়াসরিববাসীকে সুসংহত করে এবং মদিনা রাষ্ট্রের পুনর্গঠন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধশালী করণে বিরাট অবদান রাখে। মূলত এ সনদ ছিল রণ উম্মাদ আরব জাহানের শান্তি ও সহাবস্থান এবং সম্প্রীতি স্থাপনের এক মহাপরিকল্পনা। তাই ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, “এ সংবিধানই অরাজকতাপূর্ণ একটি নগরকে রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত করে।”

### যুগান্তকারী মহানায়ক :

মহানবী (স) যে নিছক একজন ধর্ম প্রচারকই নন; বরং বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, কূটনীতিক ও বিপ্লবী মহাপুরুষ ছিলেন তা এ সনদে প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যুর যথার্থ বলেছেন : (The prophet) his real greatness- a master mind not only of his own age but of all ages.” “হযরতের (স) বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগেরই নয়; বরং সর্বযুগের ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

### ইসলামের প্রসারতা বৃদ্ধি :

এ সনদের মাধ্যমে ইসলামের প্রসারতা ও শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

### স্থিতিস্থাপক সংবিধান :

মদিনার সনদটি ছিল খুবই স্থিতিস্থাপক। রাসূল (স)-এর জীবদ্দশাতেই সমগ্র আরবের লোকেরা ইসলাম ধর্ম কবুল করে। সে দিনের নগর রাষ্ট্র পরিণত হয় একটি বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যে যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ হয়।”

**ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদঃ**

সনদের মাধ্যমে ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি কামনা করে। প্রতিবেশীর ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন মতবাদকে উদার মনোভাব নিয়ে সহ্য করতে মানুষ মাত্রকেই শিক্ষা দেয়। আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে মুসলমান-অমুসলমান সকলেরই সমান অধিকার, সমান কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে এ সনদ সচেতন করেছিল।

**স্বদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকবচঃ**

সনদে জন্মভূমি স্বদেশ রক্ষার জন্য মুসলমান-অমুসলমান সকলেরই সমান দায়িত্ব আরোপ করেছে। সকলকেই একযোগে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিজেদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী হলে বা শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে সে যদি আপন সন্তানও হয়, তার ক্ষমা নেই। এর ফলে নতুন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আর কোন চিন্তা রইলো না।

**শাসক-শাসিতের দায়িত্বানুভূতিঃ**

মদিনা সনদের মাধ্যমে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলো যে শাসক ও শাসিত প্রত্যেকেই সমান দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে। এই সনদ শাসক ও শাসিতের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করে আরবজাতিকে সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেছিল।

**আইনের চোখে সবাই সমানঃ**

সকলের জন্য বিধি ও আইন সমানভাবে প্রযোজ্য। আইনের চোখে শাসক ও প্রজা উভয়েই সমান। তিনি নিজেই রাষ্ট্রীয় আইন এবং আল্লাহর হুকুম অকুণ্ঠভাবে মেনে চলেছেন। আর সকলকে সে আইনের অনুসরণ করতে বলেছেন।

**সার-সংক্ষেপ**

মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং শিশু রাষ্ট্রটির ভীতকে মজবুত করতে একটি সার্বজনীন সনদ প্রণয়ন করেন। একে 'মদিনার সনদ' বলা হয়। এ সনদ সামাজিক নিরাপত্তা, বিচার ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বিভিন্ন বিষয়, সর্বোপরি বিবাদ মিটমাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নবীজীর উপর ন্যস্ত করাসহ সমুদয় বিষয় ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এ সনদই বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। 'মদিনা সনদ' মহানবী (স)-এর এক অনন্য কীর্তি। বিশ্বের ইতিহাসে এ সনদ মানবতার মুক্তির মাইল ফলক। এ সনদের মাধ্যমে মহানবীর (স) রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাংগঠনিক প্রতিভা, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা, ধর্মীয় সহনশীলতা, জাতি সংগঠক ও কালোত্তীর্ণ রাষ্ট্র নায়কোচিত বিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.২****নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন**

১. যে সনদ কে পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান বলা হয়-  
ক. জাতি সংঘ সনদ  
খ. 'লীগ অব নেশন্স' সনদ  
গ. জেনেভা কনভেনশন  
ঘ. মদিনা সনদ
২. মদিনার সনদে ধারার সংখ্যা-  
ক. ৫২ টি  
খ. ১৫ টি  
গ. ৫৪ টি  
ঘ. ৭টি
৩. 'মদিনা সনদে' স্বাক্ষরকারী গোষ্ঠীগুলো হলো-  
ক. ইহুদী, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ও মুসলিম  
খ. কুরাইশ, মুসলিম ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান  
গ. পৌত্তলিক, কাফির, মুশরিক ও ইয়াহুদী  
ঘ. পৌত্তলিক, খ্রিস্টান, বনু নাযির ও আউস।

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. 'মদিনা সনদ' এর পরিচয় দিন।
২. 'মদিনা সনদের' প্রধান ধারাগুলো উল্লেখ করুন।
৩. 'মদিনা সনদের' গুরুত্ব নির্ণয় করুন।



## বদর যুদ্ধ (৬২৪ খ্রি.)



### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বদর যুদ্ধ কখন কি কারণে সংঘটিত হয় তার বিবরণ দিতে পারবেন
- বদর যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন
- বদর যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধের গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবেন।



ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটাই মুসলমান আর অবিশ্বাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সামরিক সংঘর্ষ। মক্কার কুরাইশ ও হযরত মুহাম্মদের (স) মধ্যে ৬২৪ খ্রিঃ দ্বিতীয় হিজরিতে মদিনার অদূরে ‘বদর’ নামক প্রান্তরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মহানবী (স) ও মুসলিম বাহিনী অভাবনীয়ভাবে বিজয়লাভ করে এবং কুরাইশ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। এ যুদ্ধের ফলে প্রমাণিত হয় ইসলাম হল সত্য এবং অজেয়। আর মক্কার মুশরিকরা যে ভ্রান্ত তা প্রমাণিত হয়।

### বদর যুদ্ধের কারণ

বদর যুদ্ধের প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপ :

#### ১. ইসলামের অগ্রযাত্রায় কুরাইশদের জ্বালাতন :

হিজরতের পর মুহাম্মদ (স) মদিনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। মহানবীর (স) এ ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্ষমতা ও ইসলামের অগ্রযাত্রায় কুরাইশদের মনে ঈর্ষা ও শত্রুতার উদ্বেক হয়। তারা উদীয়মান এ রাষ্ট্র এবং এর মহান নায়ককে ধ্বংস করার শপথ করে। বদরের যুদ্ধ এরই ফলশ্রুতি।

#### ২. মদিনাবাসীদের উপর কুরাইশদের আক্রোশঃ

হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর সাথীদের মদিনাতে আশ্রয় দেয়ার কারণে মদিনাবাসীদের ওপর কুরাইশরা ক্ষেপে যায়। জন্মভূমি মক্কা হতে হযরতকে বিতাড়িত করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তাঁকে এবং নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য তাঁরা ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

#### ৩. মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাইর ষড়যন্ত্র :

মহানবীর (স) নেতৃত্ব খর্ব করার জন্য মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই গোপনে কুরাইশদের সাথে ষড়যন্ত্র করে। কারণ, তার মদিনার শাসক হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু নবীর আগমনে তা সম্ভব হয়নি।

#### ৪. মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র :

মুনাফিক শ্রেণী ইহুদীদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এবং মহানবী (স) তথা ইসলামের ধ্বংস সাধনের জন্য কুরাইশদের সাথে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

#### ৫. ইহুদীদের ষড়যন্ত্র :

মদিনায় হযরত (স)-এর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি ইহুদীগণ সহ্য করতে পারেনি। মদিনা সনদের কথা ভুলে গিয়ে ধর্মীয় এবং নাগরিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও তারা মহানবীর (স) বিনাশ সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা মদিনায় মুসলমানদের গোপন সংবাদসমূহ মক্কার কাফিরদের কাছে সরবরাহ করে মদিনা আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করতে থাকে।

#### ৬. মদিনা সনদের শর্তভঙ্গ :

মুনাফিক গোষ্ঠী ও বিশ্বাসঘাতক ইহুদীরা মদিনা সনদের চুক্তির বরখোলাপ করে গোপনে সারা মদিনায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছিল। তারা মহানবীর (স) মহানুভবতা ও উদারতার সুযোগে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তৎপর হয়ে উঠে।

#### ৭. অর্থনৈতিক কারণ :



নির্বিন্বে ব্যবসায় বাণিজ্য করার সুযোগ হারাতে পারে এ আশংকায় কুরাইশরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ব্যবসায় ও তীর্থযাত্রা বন্ধ হলে কুরাইশগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে ভেবে ইসলামের মূলোৎপাটনে বাণিজ্যের অজুহাতে এক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া যায়। সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার দিনার মূল্যের ধন-রত্ন এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পথে মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে মক্কা সাহায্য চেয়ে পাঠায়। আবু জেহেল এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা হয়।

#### ৯. দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজ :

মক্কার বাণিজ্য পথে বসবাসকারী বিভিন্ন আরব গোত্র কুরাইশদের পক্ষে কাজ করত এবং মহানবীর (স) বিরোধিতা করত। মদিনার সীমান্তবর্তী এলাকায় কুরাইশগণ ও তাদের সাহায্যকারী আরব গোত্র মুসলমানদের শস্যক্ষেত, ফলবান গাছপালা, উট, ছাগল লুট করে নিত এবং জ্বালিয়ে দিত, ধ্বংস করত এবং অপহরণ করত। সুতরাং মহানবী (স)-এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

#### ১০. নাখলার খণ্ডযুদ্ধ :

কুরাইশদের ক্রমবর্ধমান লুটতরাজ ও অত্যাচার বন্ধ করার জন্য মহানবী (স) আব্দুল্লাহ ইবন জাহাশের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি টহলদার বাহিনী মক্কা প্রেরণ করেন। হযরতের নির্দেশ ছিল শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ রাখা। কিন্তু সেখানে কুরাইশ দলের সাথে তাদের খণ্ড যুদ্ধ বাঁধে। এই নাখলার খণ্ডযুদ্ধকে বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

#### ১১. ইসলাম ও মহানবী (স)-কে নির্মূলের বাসনা :

মক্কার কুরাইশরা ইসলাম ও তার মহান নায়ক মুহাম্মদ (স)-কে নির্মূলের বাসনা পোষণ করত অহর্নিশ। ইসলামের অনিবার্ণ দ্বীপ শিখাকে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দেয়ার মানসেই তারা মদিনা আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়। আর মহানবী (স) আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলে চূড়ান্ত সংঘর্ষ বাঁধে।

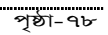
#### ১২. ওহীর নির্দেশ :

মক্কার কুরাইশদের সমরাভিযানে হযরত (স) যখন খুবই বিচলিত; এমন অবস্থায় মহান আল্লাহ তাআলা মহানবীর (স) কাছে প্রত্যাদেশ পাঠিয়ে নির্দেশ দেন- ‘আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা তোমার সাথে যুদ্ধ করে। তবে সীমালঙ্ঘন করো না’ (আল-কুর’আন ২ঃ১৯০)

#### বদর যুদ্ধের ঘটনা :

কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পেয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর নির্দেশ পেয়ে অনুপ্রাণিত হলেন। “আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তবে সীমা লঙ্ঘন করো না, কারণ আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীগণকে পছন্দ করেন না।” যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রণাসভার পরামর্শক্রমে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ (১৭ রমযান ২য় হিজরি) ২৫৩ জন আনসার এবং ৬০ জন মুহাজির নিয়ে গঠিত একটি মুসলিম বাহিনীসহ কুরাইশ বাহিনীর মোকাবেলার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স) বের হলেন।

মদিনা হতে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর উপত্যকায় মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে বিধর্মী কুরাইশদের সংঘর্ষ হয়। হযরত মুহাম্মদ (স) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করে অনুপ্রেরণা দান করেন। আল-আরিসা পাহাড়ের পাদদেশে মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপিত হল এবং এর ফলে পানির কুপগুলো তাঁদের আয়ত্তে ছিল। ঐতিহাসিক আল-ওয়াকিদী বলেন, ‘হযরত মুসলিম সৈন্য সমাবেশের জন্য এমন একটি স্থান বেছে নেন যেখানে, সূর্যোদয়ের পর যুদ্ধ শুরু হলে কোন মুসলমান সৈন্যের চোখে সূর্য কিরণ পড়বে না। প্রাচীন আরব-রেওয়াজ অনুযায়ী প্রথমে মল্লযুদ্ধ হয়। মহানবীর (স) নির্দেশে যথাক্রমে হযরত আমীর হামযা, আলী ও আবু উবায়দা (রা), কুরাইশ পক্ষের নেতা উতবা, শাইবা এবং ওয়ালিদ ইবনে উতবার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে শত্রুপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হন। উপায়ান্তর না দেখে আবু জেহেল বিধর্মী বাহিনীসহ মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতে লাগল, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা এবং সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করা কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসামান্য রণনৈপুণ্য, অপূর্ব বিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ বদর যুদ্ধে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করেন। এ যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ সৈন্য নিহত হয়, সমসংখ্যক সৈন্য বন্দী হয়। অপর দিকে মাত্র ১৪ জন মুসলিম সৈন্য শাহাদত বরণ করেন। আবু জেহেল এ যুদ্ধে নিহত হয়।



## চিত্র- ৮ : বদরের যুদ্ধের মানচিত্র

**বদর যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ**

বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের সামরিক বিজয়ের গৌরব সূচনাকারী বদর যুদ্ধের গুরুত্বের কতিপয় দিক হচ্ছে :

**মীমাংসাকারী যুদ্ধ**

বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক চূড়ান্ত যুগান্তকারী ঘটনা। এ চূড়ান্তকারী যুদ্ধে জয়লাভ না করলে ইসলাম পৃথিবীর বুক হতে চিরতরে মুছে যেত। মিথ্যার ওপর সত্যের, অজ্ঞতার ওপর জ্ঞানের জয় অবশ্যম্ভাবী; বদর যুদ্ধে জয়লাভ তাই প্রমাণিত হল।

**পরবর্তী বিজয়ের পথপ্রদর্শক**

বিশাল কুরাইশ বাহিনীর ওপর মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনীর এ বিজয় মুসলমানদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে পরবর্তী সকল বিজয়ের ফলক উন্মোচন করল।

**কুরাইশদের দম্ব খর্ব ও ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি**

এতে কুরাইশদের গগন চুম্বী দম্ব-খর্ব এবং সকল প্রকার অহংকার ধুলিস্যাৎ হয়। এ যুদ্ধে পরাজয় মক্কাবাসীদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার মূলে চরম আঘাত হানে। পক্ষান্তরে ইসলামের গৌরব ও শক্তি মদিনায় এবং মদিনার বাইরে বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যে ধর্ম এতদিন আব্রাহামের চিন্তায় শক্তিত থাকত, সেই ধর্ম তখন বরং হামলা করার মত শক্তি সঞ্চয় করল।

**হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শক্তিবৃদ্ধি**

বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের কাছে শুধু একটি যুদ্ধ নয়। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিমিত। এই যুদ্ধ মুহাম্মদের (স) মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

এ জয়ের ফলে মহানবীর (স) বৈষয়িক শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক হিট্রি বলেন, “সামরিক লড়াই হিসেবে বদরের যুদ্ধ যতই ছোট হোক না কেন, এতে হযরত মুহাম্মদ (স) এর পার্থিব শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়।”

**অর্থনৈতিক লাভ**

বদরে মুসলমানরা প্রচুর গনীমাতের মাল লাভ করে এবং যুদ্ধবন্দী পণ দ্বারা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হয়, যা একটি উদীয়মান শক্তির প্রয়োজন ছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাক্রম ইসলাম বিস্তারের বাহন হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্র-শস্ত্র, ঘোড়া, উট ও আরও অনেক মূল্যবান বস্তু লাভ করে। এ সমস্ত পণ্য দ্রব্য মুসলমানদের শক্তিবৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করল।

**ইহুদি ও বেদুঈনের ওপর প্রভাব**

এ যুদ্ধ ইহুদি ও আরবের বেদুঈনের প্রতি বেশি প্রভাব বিস্তার করে। তারা বুঝতে পারে যে, ইসলাম এক অজেয় শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ইয়াহুদী ও বেদুঈন জাতিও ইসলামের শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা লাভ করল। তারা শত্রুতা ত্যাগ করল না বটে। কিন্তু মুসলমানদেরকে আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে সাহস পেল না।

**রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার সূচনা**

বদর যুদ্ধ মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপন করে।

**নবযুগের সূচনা**

মানবতার ইতিহাসে বদর যুদ্ধ নবযুগের সূচনা করেছে। মহানবী (স) উদারতায় মুগ্ধ হয়ে বন্দীদের অনেকেই ইসলামের ছায়াতলে আসে।

**ঈমানের সৃষ্টি**

বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ করে ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ধর্মের জন্য প্রাণদানের দৃঢ় সংকল্পই পরবর্তীকালে মুসলমান জাতিকে অজেয় করে তুলেছিল। বদরের সফলতা মুসলমানদের মধ্যে এ আশ্বাস সৃষ্টি করে যে, ইসলামের শক্তির সম্মুখে যে কোন শক্তি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য।

**নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ঈমানী শক্তির বিজয়**

অপূর্ব কর্তব্যপরায়ণতা, অতুলনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা, বীরত্ব-বিক্রম এবং অটুট ঈমানী শক্তিতেই মুসলমানগণ সর্বক্ষেত্রে জয়লাভ করেছেন।

### ইসলামের প্রচার-প্রসারে নতুন প্রেরণা

বদর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইসলাম প্রচার ও বিস্তারেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য নতুন প্রেরণা সংযোজিত হয়েছিল। এ সময় হতে ইসলামের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণ ঘটে। জোসেফ হেল-এর মতে, “বিধর্মীদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়।”

### বিশ্বজয়ের সূত্রপাত

বদর যুদ্ধ মুসলমানদের বিশ্বজয়েরও সূত্রপাত করে। এতে সফলতা লাভের পর এক নতুন মনোবল ও সামরিক প্রেরণায় মুসলমানদের হৃদয় ভরে যায়। আর বিশ্বজয় করার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

### অভিনব ইতিহাস সৃষ্টি

ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। মানবতার ইতিহাসে এ যুদ্ধ এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। যুদ্ধ শেষে মহানবী (স) নিহত শত্রুদের পরিত্যক্ত লাশ সযত্নে সমাহিত করেছিলেন। বন্দীদের প্রতি তিনি মানবিক আচরণ ও উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন- যার দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে বিরল। বিজয়ী হলেও মুসলমানরা কোনরূপ দম্ভ, অহংকার ও উল্লাসে মেতে ওঠেনি বরং মহান প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। মহানবী (স) ও মুসলমানদের উদার এবং মানবিক আচরণ মুগ্ধ হয়ে যুদ্ধবন্দীদের অনেকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

### সার-সংক্ষেপ

হিজরি দ্বিতীয় সনের ১৭ রমযান বিশ্বের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিনে হযরত মুহাম্মদ (স) মাত্র তিনশত তের জনের মুসলিম বাহিনী নিয়ে মদিনার ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক মাঠে আবু জেহেলের সুসজ্জিত এক হাজার দুর্ধর্ষ কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে মরণ-পণ যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। আল্লাহর অসীম করুণায় মুসলমানগণ জয়ী হন। ৭০ জন কুরাইশ নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলমানদের মাত্র ১৪ জন শাহাদাত বরণ করেন।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৩

#### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

- ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মীমাংসাকারী যুদ্ধ হচ্ছে-  
ক. বদর যুদ্ধ খ. উহুদ যুদ্ধ  
গ. আহযাব যুদ্ধ ঘ. ইয়ারমুকের যুদ্ধ।
- বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়-  
ক. দ্বিতীয় হিজরির ২৭ রমযান খ. দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমযান  
গ. ৮ম হিজরির ১০ জিলহাজ্জ ঘ. তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে
- বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়-  
ক. ইয়াহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে খ. কুরাইশ ও খ্রিস্টানদের মধ্যে  
গ. কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে ঘ. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে
- বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল-  
ক. ১০০০ জন খ. ৩০০০ জন  
গ. ৫০০ জন ঘ. ৩১৩ জন
- বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা নেতার নাম-  
ক. আবু সুফিয়ান খ. উতবা  
গ. আবু জেহেল ঘ. শায়বা।

#### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- বদর যুদ্ধের ৫টি কারণ উল্লেখ করুন।
- বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী বিবৃত করুন।
- বদর যুদ্ধের গুরুত্ব নির্ণয় করুন।
- বদর যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?



## উহুদ যুদ্ধ (৬২৫ খ্রিস্টাব্দ)



### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উহুদ যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন
- উহুদ যুদ্ধের ঘটনা উল্লেখ করতে পারবেন
- উহুদ যুদ্ধের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের জয় পরাজয় মূল্যায়ন করতে পারবেন।



হিজরি দ্বিতীয় সনের ১৭ রমযান বদর প্রান্তরে মুসলমানদের সাথে কুরাইশ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও পরাজয়ের পর কুরাইশরা প্রতিশোধ নিতে আবাবারো পরের বছর মদিনা আক্রমণ করে। উহুদ যুদ্ধ ছিল কুরাইশদের প্রতিশোধের বহিঃপ্রকাশ। মদিনার অদূরে উহুদ উপত্যকায় এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে তা উহুদ যুদ্ধ নামে পরিচিত।

### উহুদ যুদ্ধের কারণ

বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় ও মুসলমানদের ক্রমশ উন্নতি কুরাইশদের গাভ্রদাহের কারণ হয়েছিল। তারা মুসলমানদের চিরতরে ধ্বংস করার লক্ষ্যে আরেকটি যুদ্ধের প্রত্তুতি নেয়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে কতিপয় কারণ ছিল। তা হলো :

#### ১. বদর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়

হিজরি দ্বিতীয় সনে কুরাইশরা বদর যুদ্ধে পরাজিত হলে প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষবশত মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য পুনরায় প্রত্তুতি গ্রহণ করে। যুদ্ধে আপনজন ও নেতাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তারা শোককে শক্তিতে পরিণত করে মদিনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

#### ২. ইহুদীদের কুমন্ত্রণা

কুরাইশদের প্রতিহিংসার মূলে ইহুদ যুগিয়েছিল ষড়যন্ত্রকারী বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদী চক্র। বদর যুদ্ধের পর ইয়াহুদী কবি 'ইবনে আশরাফ' মক্কায় গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদেরকে উস্কানি দিত। এমনকি কবি নানা কবিতা রচনা করে কুরাইশদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন আরো বৃদ্ধি করে দেয়।

#### ৩. মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধিতে হিংসা

মক্কা থেকে মুসলমানরা মদিনায় হিজরাত করার পর ক্রমশ তাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের ঈমানী শক্তি ও সাহসিকতা আরো বেড়ে যায়। এ সময় আরবসহ পার্শ্ববর্তী অনেক দেশে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে মুসলমানরা সক্ষম হয়। এতে কুরাইশরা বেশি হিংসাপরায়ণ হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে।

#### ৪. আবু সুফিয়ানের বর্বর আচরণ

আবু সুফিয়ান মদিনার ইয়াহুদীদেরকে অনুপ্রাণিত করতে দু'শত অশ্বারোহীসহ মদিনার দিকে যাত্রা করে। মদিনায় কতিপয় ইয়াহুদীদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে মক্কা ফেরার পথে সাদ ইবনে আমর নামক একজন সাহাবীকে হত্যা করে। কয়েকটি বাড়ি লুট করে এবং চারণভূমিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এ সংবাদ পেয়ে রাসূল (স) তাদের পশ্চাৎ ধাবন করলেন। উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার এটিই প্রত্যক্ষ কারণ।

#### ৫. মদিনার প্রাধান্য

বদর যুদ্ধের বিজয়ে মদিনায় ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এতে নগরীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স)ও মদিনার সকল গোত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে এক অভূতপূর্ব প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ করেন। কুরাইশরা তাই মুসলমানদের সাথে পুনরায় শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

#### ৬. বনু হাশিম-উমাইয়া বিরোধ

মদিনায় রাসূল করিম (স)-এর নেতৃত্বে বনু হাশিম গোত্রের ক্রমোন্নতিতে কুরাইশদের অন্য শাখা উমাইয়াদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনিবার্য হয়ে উঠল। তারা তাদের দলনেতা আবু সুফিয়ানকে সর্বোত্তমভাবে সহযোগিতা করতে লাগল আর এসব কারণে উহুদ যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে।

## উহুদের ঘটনা

কুরাইশরা প্রতিশোধের জন্য মরিয়্যা হয়ে উঠল। ইসলামের এ জুলন্ত শিখাকে নির্বাপিত করতে সবাই বদ্ধ পরিকর হল। আবু সুফিয়ান পুনরায় তিন হাজার সৈন্যের আর এক নতুন বাহিনী সংগঠিত করল। সৈন্যদের মধ্যে সাতশ বর্মধারী, দু'শ অশ্বারোহী ও অবশিষ্টরা ছিল উষ্টারোহী ও পদাতিক। তায়েফ হতে আরো ১০০ সৈন্য এসে এ সেনাদলে যোগ দিল। এ বিশাল বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ান মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হল।

তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসের ১৪ তারিখে হযরত মুহাম্মদ (স) জুম্মার নামায আদায় করে সমবেত মুসলিমদের পরামর্শ সভায় বললেন, এবার আমাদের নগর ছেড়ে দূরে গিয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না। তাতে বিপদ ঘটতে পারে। তোমাদের মত কি? বায়োজেষ্ঠ মুহাজির ও আনসারগণ সকলে মহানবী (স)-এর মতে সাড়া দিলেন। কিন্তু তরুণ দলের কাছে এ প্রস্তাব মনঃপুত হল না। তারা এ ব্যবস্থাকে কাপুরুষতা মনে করে মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া সমীচীন ভাবল। শেষে অনেকেই তাদের এ মত সমর্থন করল। হযরত মুহাম্মদ (স) সকলকে রণসাজে সজ্জিত হতে নির্দেশ দিলেন। মোট এক হাজার সৈন্যের এ বাহিনীর ২ জন মাত্র অশ্বারোহী, ৭০ জন বর্মধারী, ৪০ জন তীরন্দাজ, বাকি সকলেই বর্মহীন পদাতিক বাহিনী। মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ৩০০ সৈন্য সমেত যোগদান করেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে অজুহাত দেখিয়ে দলত্যাগ করল। মদিনা হতে তিন মাইল দূরে উহুদ পাহাড়। সেই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গিয়ে হযরত একটি সুবিধাজনক স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করলেন, সম্মুখে ময়দান, পিছনে পাহাড়।

আবু সুফিয়ানও তার বিরাট বাহিনী নিয়ে পূর্বেই উহুদ প্রান্তরে অপেক্ষা করছিল। মুসলিম পক্ষের বামপাশে পর্বতগাত্রে একটি গিরিপথ ছিল। পরিণামদর্শী মহানবী (স)-এ গিরিপথের পশ্চাদিক হতে শত্রুর হামলার আশংকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি তীরন্দাজ বাহিনী সেখানে মোতায়েন করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেখানে তাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে বললেন। মল্লযুদ্ধে কুরাইশদের প্রসিদ্ধ বীর তালহা ও ওসমান নিহত হল। মুহুর্তে দুজন বীরের শোচনীয় পরাজয় দেখে কুরাইশগণ সমবেতভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। মুসলিম বীরকেশরীদের হাতে শত্রু পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ময়দানে টিকতে না পেরে কুরাইশগণ পালাতে আরম্ভ করল। মুসলমানগণ শত্রু পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগল। হযরতের নির্দেশ ভুলে গিরিপথে নিয়োজিত তীরন্দাজগণ সংগ্রহ কার্যে অংশগ্রহণ করল। ৫০ জনের মধ্যে মাত্র দুজন সেখানে রইল। দূর হতে সূচতুর খালিদ এ দৃশ্য দেখে তার অশ্বারোহী সেনাদল নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। দুজন তীরন্দাজকে সে অনায়াসে পরাজিত ও নিহত করে পশ্চাৎ দিক হতে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। পলায়নপর কুরাইশ সৈন্যরাও ফিরে আসল। যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হল। বীরবর হামযা ও মোসায়ের (রা) যুদ্ধে শহীদ হলেন। এবার কুরাইশগণ মহানবী (স)-কে লক্ষ্য করে তীর ও অন্যান্য অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল। কয়েক জন মুসলমান নিজেদের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করে মহানবী (স)-কে রক্ষা করার জন্য ব্যুহ রচনা করলেন। বহু তীর তাঁদের শরীর বিদ্ধ করল। এমন সময় কাফির ইবনে কামিয়া মহানবী (স)-এর অতি নিকটে এসে তলোয়ার নিক্ষেপ করল। এতে তিনি আহত হয়ে এক গর্তে পড়ে গেলেন। ইবনে কামিয়া বলে উঠল আমি মুহাম্মদকে (স) হত্যা করেছি। যুদ্ধের মাঠে এ খবর রটে গেল যে, মুহাম্মদ (স) নিহত হয়েছেন। এতে বহু মুসলমান হতোদ্যম হয়ে পড়ে। হযরতের গায়ে দুটি লৌহ বর্ম ছিল। এর ওজন ও যখমের যন্ত্রণায় তিনি উপরে উঠতে পারছিলেন না। হযরত তালহা কাঁধে করে রাসূলুল্লাহ (স)-কে তুলে নিলেন এবং তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। এবার বিক্ষিপ্ত সাহাবাগণ আবার মহানবী (স)-এর চতুর্দিকে সমবেত হলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) ও সাহাবাগণ যারা মাঠে ছিলেন সকলে পর্বতে আরোহণ করলেন। কাফেরগণ উঠতে চেয়েও ব্যর্থ হল। কাফির নেতা আবু সুফিয়ান উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, মুহাম্মদ আছে কি? হযরত বললেন, চুপ থাক; আবার বললেন চুপ থাক। তখন সে চিৎকার করে বলল, মনে হয় এ তিনজনই নিহত হয়েছে। হযরত ওমর ধৈর্যচ্যুত হয়ে বলে ফেললেন- আল্লাহর রহমতে তিনজনই তোমাকে বিপদগ্রস্ত করার জন্য জীবিত আছেন। তারপর আবু সুফিয়ান বলল, আগামী বছর বদরে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে আবার যুদ্ধ হবে। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (স)-এর পবিত্র দাঁত শহীদ হয়। এতে ৭০ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। কুরাইশদের পক্ষে নিহত হয় ২৩ জন।



চিত্র- ৯ : উদ্ভদ যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র

## উদ্ভদ যুদ্ধের ফলাফল

## ঈমান ও বিশ্বাসের পরীক্ষা

উহাদের পরাজয় অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও আত্মলঙ্ঘনের ফল নয়; বরং এটা ছিল ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা। কারণ নিরবচ্ছিন্ন বিজয় কোন জাতির ভাগ্যেই জোটে না, বরং বিজয়ের আনন্দ ও পরাজয়ের গ্লানিকে সঙ্গী করেই বৃহত্তর সাফল্যের পথে এগোতে হয়। এজন্যই প্রয়োজন ধৈর্য ও ঈমানের। কুরাইশদের বিজয় দেখে মুসলমানরা হতাশ হয়ে গেলে আল্লাহ ইরশাদ করেন- “তোমারা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, যদি তোমরা মু’মিন হও, তাহলে তোমাদের বিজয় আসবেই।”

## মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি

এ যুদ্ধে মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। পরাজয়ের পরই তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে যুদ্ধ বিধবস্ত হওয়ার পরও করাইশ বাহিনীকে ধাওয়া করেছিলেন।

### মুনাফিক ও মু'মিন চিহ্নিতকরণ :

এ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের কাছে মনাজিক ও মু'মিন কারা তা চিহ্নিত হয়ে গেল।

## ইহুদীদের বহিষ্কার

এ যুদ্ধের ফলে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ইয়াহুদীদের দু'টি গোত্র বানু কাইনুকা ও বানু কুরায়যা পর্যায়ক্রমে মদিনা হতে বিতাড়িত হয়।

**জয়-পরাজয়ে সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা**

এ যুদ্ধের পর জানা গেল নেতার আনুগত্য না মানলে কী করণ দশা হতে পারে। আর জয়-পরাজয় সকল অবস্থাতেই আল্লাহর আনুগত্য ও সন্তুষ্ট থাকাই হচ্ছে খাঁটি মু'মিনের কর্তব্য।

**সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত**

উহুদের বিপর্যয় মুহূর্তে সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানরা নিজেদের নবীকে রক্ষা করেন। উহুদের বিপর্যয়ই মুসলমানদের সুশৃঙ্খল সামরিক জাতিতে পরিণত করে।

**উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়-পরাজয়**

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা আপাতত দৃষ্টিতে পরাজয়বরণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই বিজয় লাভ করেছিলেন। এ সাময়িক পরাজয়ে মুসলমানদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু রহস্য ও শিক্ষা নিহিত ছিল। এ পরাজয় ছিল ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এ পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়। এছাড়াও কাফিররা বিজয়লাভ করে মদিনায় প্রবেশ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেনি। যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা পশ্চাদ্ধাবন করলে তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেছিল। কাজেই পলায়ন তো বিজয়ের লক্ষণ নয়। শত্রু সৈন্যও ২৩ জনের মতো নিহত হয়েছিল। কাফিরদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য এ ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। মুসলমানরা যদি পরাজিত হত, তবে কুরাইশরা মদিনা দখলের যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল তা বাস্তবায়নের ধারে কাছেও যেতে পারেনি কেন? কুরাইশদের প্রাধান্য বিস্তার লাভ না করার আরেকটি কারণ হচ্ছে আবু সুফিয়ানের বক্তব্য। সীরাতে ইবনে হিশামে রয়েছে- আবু সুফিয়ান উহুদের পাদদেশে দাঁড়িয়ে উমর (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, “মনে রাখবে, আগামী বছর পুনরায় বদর প্রান্তরে তোমাদের সাথে মোকাবেলা হবে।” এ দ্বারা বুঝা যায় তারা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

উহুদ যুদ্ধ সত্যিকার অর্থে মুসলমানদের জন্য এক কঠোর অগ্নি পরীক্ষা ছিল। এ যুদ্ধে মুসলমানরা নৈতিক শিক্ষা লাভ করেছিল। যা পরবর্তী কালে ইসলাম বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

কুরাইশরা হিজরি তৃতীয় সনের ১৪ শাওয়াল মুসলমানদের মোকাবিলা করতে উহুদ প্রান্তরে মুখোমুখি হয়। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সৈন্য ছিল ৩,০০০। এ সংবাদ পেয়ে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ অনুযায়ী ১,০০০ সৈন্যের এক কাফেলা উহুদের দিকে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ৩০০ সৈন্য নিয়ে পলায়ন করে।

নবী করিম (স) মুজাহিদদেরকে সারিবদ্ধভাবে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে নির্দেশ দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে ৫০ জন সুদক্ষ তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা করে পাহাড়ের গিরিপথে মোতায়েন করেন। নির্দেশ ছিল জয়লাভ করলেও যেন তারা এ পথ না ছাড়েন। যুদ্ধের প্রথমার্শে মুসলমানরা জয়লাভ করেন। তীরন্দাজ বাহিনী রাসূলের নির্দেশ ভুলে বিজয় উল্লাসে গাণিমাতের মাল কুড়িয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে শত্রু সেনা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সুযোগ পেয়ে পাহাড়ের পেছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর তীব্র আক্রমণ চালায়। মুসলমানদের এক বড় অংশ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে।

এমতাবস্থায় আবু বকর, আলী (রা) প্রমুখ ১১জন সাহাবী নবীজীকে ঘিরে রেখে রক্ষা করেছিলেন। তবুও শত্রুর তরবারীর আঘাতে তিনি মাথায় আঘাত পেলেন এবং প্রস্তরাঘাতে তাঁর একটি দাঁতের কিয়দংশ শহীদ হয়ে যায়। মুসলমানগণ অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয়বরণ করল। হযরত হামযাহ (রা) সহ এ যুদ্ধে ৭০/৭৩ হন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন এবং ২৩ জন শত্রু সৈন্য নিহত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মুসলমানরা পরাজিত হলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বিজয় হয়। মুসলমানরা এ যুদ্ধ থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করেন।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৪

### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ-  
ক. দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমযান  
খ. তৃতীয় হিজরির ১৪ শাওয়াল  
গ. ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের রমযান মাসের ২৭ তারিখ  
ঘ. চতুর্থ হিজরির ১০ জিলহাজ্জ।
২. উহুদ যুদ্ধে কুরাইশ দলে সৈন্য সংখ্যা ছিল-  
ক. ৩০০০ জন  
খ. ১০০০০ জন  
গ. ১০০০ জন  
ঘ. ৩১৩ জন
৩. উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীতে সৈন্য ছিল-  
ক. ৭০০ জন  
খ. ৩১৩ জন  
গ. ৩০০ জন  
ঘ. ১০০০ জন।
৪. উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী মুসলমানদের-  
ক. ৭০ জন  
খ. ৭২ জন  
গ. ২৩ জন  
ঘ. ১০ জন

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. উহুদ যুদ্ধের ৫টি কারণ উল্লেখ করুন।
২. উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিবৃত করুন।
৩. উহুদ যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করুন।
৪. উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের জয়-পরাজয় মূল্যায়ন করুন।



## খন্দকের যুদ্ধ (৬২৭ খ্রিস্টাব্দ)



### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খন্দকের যুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন
- খন্দকের যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন
- খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা বিবৃত করতে পারবেন
- এ যুদ্ধের বিভিন্ন নাম করণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন
- খন্দকের যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।



কুরাইশরা ইসলামের অগ্রযাত্রা সহ্য করতে পারছিল না। এরা প্রথম থেকেই ইসলামকে এক ফুঁৎকারে নিভিয়ে দেয়ার জন্য বদর, উহুদ এ দু'টো রণাঙ্গণে মুখোমুখি হয়। কিন্তু তাতে ইসলামের শক্তি বা মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়ে বরং আরো বেশি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। এবার তারা সম্মিলিতভাবে সমস্ত আরব বেদুঈন গোত্রকে সাথে নিয়ে শেষবারের মত সাড়াশি আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী মদিনা আক্রমণ করে। মহানবী (স) সীমিত শক্তিতে, অভিনব রণ কৌশলে তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ফলাফল যায় সত্যের পক্ষে।

### খন্দকের যুদ্ধের কারণ

খন্দকের যুদ্ধ যে সকল কারণে সংঘটিত হয়েছিল তা হচ্ছে-

#### ১. মুসলিম উত্থানকে সমূলে ধ্বংস করার ইচ্ছা

উহুদ যুদ্ধে কাফিররা বিজয় লাভ করলেও মুসলিম উত্থানকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। এবার তারা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

#### ২. ইসলামের প্রসার ও মদিনা রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধি

উহুদের বিপর্যয়ের পর মুসলিম শক্তি আরও সুসংহত হয়। একনিষ্ঠভাবে প্রচারের ফলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময় মদিনা রাষ্ট্রের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তদুপরি মদিনায় মুসলিম অধিপত্য বিস্তারের ফলে কুরাইশদের মক্কা-ইরাক বাণিজ্য হুমকির মুখে পড়ে। এতে ইসলামদ্রোহী কুরাইশ-ইয়হুদীরা আতংকিতবোধ করে এবং মুসলমানদের বিনাশ সাধনের জন্য যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে আরবের সকল গোত্রকে এক্যবদ্ধ করে।

#### ৩. বেদুঈন গোত্রসমূহের হঠকারিতা

ইসলামের অগ্রযাত্রার কারণে আরব বেদুঈন গোত্রসমূহ চিরাচরিত লুটতরাজ অবাধে করতে না পেয়ে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে এবং কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনীতে যোগ দেয়। বেদুঈন গোত্রগুলো প্রায় ৬,০০০ সৈন্য নিয়ে এ যুদ্ধে শরীক হয়।

#### ৪. ইহুদিদের ষড়যন্ত্র

ইতঃপূর্বে বিশ্বাস-ঘাতকতার কারণে দু'টি ইহুদি গোত্র মদিনা হতে বহিষ্কৃত হয়েছিল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্র করে এবং ইসলামদ্রোহী শক্তিকে উস্কে দেয়।

#### ৫. মুনাফিকদের গোপন আঁতাত

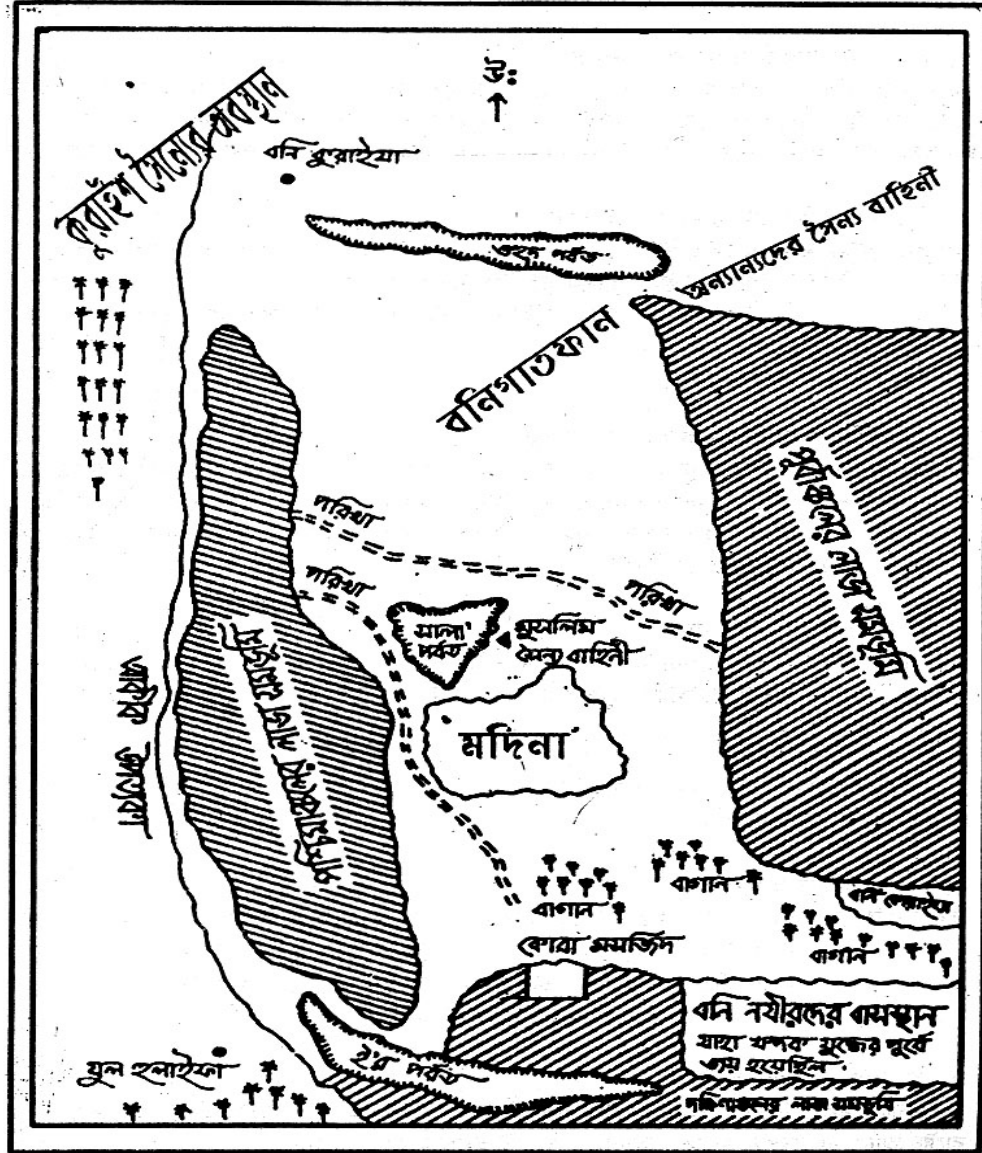
মদিনায় অবস্থান করেও এক শ্রেণীর কপট মুসলমান কুরাইশদের সাথে সবসময় গোপনে আঁতাত করতো এবং এখানকার খবরাদি তাদের পৌঁছে দিতো। মুনাফিকরা প্রায়ই মদিনা আক্রমণ করতে কুরাইশদের আহ্বান জানাতো।

#### ৬. আবু সুফিয়ানের প্রতিজ্ঞা রক্ষা

উহুদ-যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, পরের বছর তারা আবার মুসলমানদের সাথে শক্তি পরীক্ষা করবে। কিন্তু ঐ আশ্বালন কার্যে পরিণত হয়নি। কাজেই এখন যুদ্ধ করতে হলে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও শক্তিশালী আয়োজন প্রয়োজন। এ কথা ভেবে আবু সুফিয়ান সারা আরবে একটা বিরাট বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করে। আবু সুফিয়ান উহুদে আশ্বালন করেছিল। কেননা, তা না করলে তার মুখ থাকে না। তাছাড়া আরব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল যা বলবে তা করেই ছাড়বে। না করলে কাপুরুষতা প্রকাশ পাবে। এজন্য তারা ব্যাপক আয়োজনে আরবের সকল গোত্রের লোক নিয়ে সম্মিলিত বাহিনী প্রস্তুত করে। এসব কারণে পঞ্চম হিজরির জিলকদ মাসে এ ভয়াবহ যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

## যুদ্ধের ঘটনা

কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ, বেদুঈন ও ইহুদিদের ১০ হাজার সৈন্যের এক সম্মিলিত বাহিনী মদিনার দিকে অগ্রসর হলে মহানবী (স) তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসির পরামর্শক্রমে শত্রু মোকাবিলার উদ্দেশ্যে মদিনার চারপাশে 'পরিখা' বা খন্দক নির্মাণ করা হল। পরিখা বা খন্দক তেকেই এ যুদ্ধের নামকরণ করা হয়ে 'খন্দক যুদ্ধ'। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী গঠন করা হয়েছিল বলে একে আজহাব-এর যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশদের বিপুল সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারেনি। খন্দক বা পরিকার সাহায্যে মুসলমানরা কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করে। মল্ল যুদ্ধে কুরাইশ বীর আবদুদ, যাবার ও যুবাইরের পরাজয়ের পর সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হয়। তবে মুসলমানদের দৃঢ় মনোবল ও ইস্পাত কঠিন প্রতিরোধের কারণে কুরাইশ বাহিনী সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়। তদুপরি ত্রিশক্তির মধ্যকার একেবারে অভাব, বিশাল সম্মিলিত বাহিনীর খাদ্য সংকট এবং সর্বোপরি প্রচণ্ড শীত ও ঝড়ো হাওয়া প্রভৃতি কারণে সম্মিলিত বাহিনী মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে হত্যোদ্যম হয়ে সেনাপতি আবু সুফিয়ান অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন। ২৭ দিন অবরোধের পরও মদিনা আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে কুরাইশরা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে।



চিত্র-১০ : খন্দকের যুদ্ধের মানচিত্র

## ফলাফল

খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এতদিন ধরে কুরাইশগণ যে আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এবার তা শেষ হল। এ যুদ্ধে কুরাইশদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পেল। তাদের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেল। সম্মান বিনষ্ট হয়ে গেল এবং মিত্রশক্তিগণ ঘৃণায় তাদের দল ত্যাগ করে চলে গেল। খন্দকের যুদ্ধ হযরত (স) তথা মুসলমানদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিল। হযরত মুহাম্মদ (স) শত্রুদের হাত হতে মদিনাকে রক্ষা করায় মদিনাবাসী তাঁকে একচ্ছত্র নেতা বলে সম্মান করতে লাগল। এস এম ইমামুদ্দীনের মতে, “সম্মিলিত বাহিনী ভাঙনের ফলে মক্কাবাসীদের সম্পূর্ণ পরাজয় প্রতিভাত হয়ে উঠে এবং তা মদিনায় মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় কলে। ইসলাম অল্প সময়ের মধ্যে আরবদেশ তথা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে।

## গুরুত্ব বিশ্লেষণ

যে সকল বিবেচনায় ইসলামের ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম, সেগুলো হচ্ছে :

### ১. ইসলামের অগ্রাভিযানে নতুন দিগন্ত

খন্দক যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় এবং মুসলিমদের জয় লাভের ফলে ইসলামের অগ্রাভিযানে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

### ২. কুরাইশ ও ইসলামদ্রোহী শক্তির বিপর্যয়

খন্দকের যুদ্ধের মাধ্যমে কোরাইশ ও ইসলামদ্রোহী শক্তির বিপর্যয় ঘটে। বিশেষ করে কুরাইশদের দম্ভচূর্ণ হয়। তাদের সামরিক ও নৈতিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

### ৩. ইসলামের সামরিক ও আধ্যাত্মিক বিজয়

খন্দকের যুদ্ধের পর ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে। এতদিনের আতঙ্কামূলক ভূমিকার পরিবর্তে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করে ইসলাম বিরোধীদের দম্ভ চূর্ণ করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর পরই হুদাইবিয়ার সন্ধি, পরে মক্কায় উমরাহ পালন এবং মক্কা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে বিজয়।

### ৪. মহানবীর (স) মর্যাদা বৃদ্ধি

এ বিজয়ের ফলে মদিনাসহ সমগ্র আরব বিশ্বে মহানবীর (স) মর্যাদা আর বৃদ্ধি পায়। নবী হিসেবে সকলের নিকটই গ্রহণীয় হয়ে ওঠেন এবং মদিনার একচ্ছত্র নেতায় পরিণত বরিত হন।

### ৫. ইহুদীদের বহিষ্কার

বিশ্বাসঘাতক ইয়াহুদীগণকে যুদ্ধ শেষে মদিনা হতে বহিষ্কার করা হয় এবং তাদেরকে শান্তি দানে মুসলমানরা সমর্থ হয়। এভাবে মদিনা রাষ্ট্র ষড়যন্ত্র মুক্ত হয়ে ওঠে।

### ৬. মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধি

বিরাত বাহিনীকে বৃদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে বিপর্যস্ত করাতে নবীজী ও ইসলামের প্রতি মুসলমানদের ঈমান আরো বেড়ে যায়।

### ৭. পার্শ্ববর্তী জাতির উপর প্রভাব

খন্দক যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের ফলে পার্শ্ববর্তী জাতির উপর এর প্রভাব বিস্তৃত হয়। তাদের অনেকেই স্বেচ্ছায় মদিনা রাষ্ট্রের আনুগত্য প্রদর্শন করলো। আবার অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করলো।

### ৮. মুনাফিক চিহ্নিত

এ যুদ্ধের মাধ্যমে মদিনায় কারা কারা মুনাফিক তা চিহ্নিত হয়েছিল। কেননা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইহুদী ও মুনাফিকরা বহিঃশত্রুর সাথে হাত মিলিয়েছিল। এতে মুখোশধারী মুসলমানদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেল।

## সার-সংক্ষেপ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৫

### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল-  
ক. এক হাজার                      খ. ছয় হাজার  
গ. দশ হাজার                      ঘ. তিন হাজার
২. আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়-  
ক. দ্বিতীয় হিজরির রমযান মাসে                      খ. ৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে  
গ. তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে                      ঘ. ৮ম হিজরির জিলকদ মাসে।
৩. আহযাব যুদ্ধে খন্দক বা পরিখা খনন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন-  
ক. হযরত আবু বকর                      খ. হযরত উমর ফারুক  
গ. হযরত সালামান ফারসি                      ঘ. হযরত আবু জর সেফরি
৪. কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনী মদিনা অবরোধ করে রাখে?  
ক. দশ দিন                      খ. তিন দিন                      গ. ৪০ দিন                      ঘ. ২৭ দিন।
৫. আহযাব যুদ্ধে কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনী শেষ পর্যন্ত-  
ক. অবরোধ প্রত্যাহার করে পলায়ন করে                      খ. মদিনা দখল করে  
গ. শোচনীয়ভাবে পরাজয় করে                      ঘ. আক্রমণ করে চলে যায়।

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খন্দক যুদ্ধের পটভূমি বর্ণনা করুন।
২. খন্দক যুদ্ধের কারণ বিশ্লেষণ করুন।
৩. খন্দক যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করুন।
৪. খন্দক যুদ্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।



## হুদাইবিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রি.)



### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হুদাইবিয়ার সন্ধি কখন, কোথায় কেন হয়, তার বিবরণ দিতে পারবেন
- সন্ধির প্রধান শর্তসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- সন্ধির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



হুদাইবিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে। এ সন্ধি ইসলামকে আরবের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তারের সুযোগ এনে দেয়। দৃশ্যত ইসলামের স্বার্থ পরিপন্থী মনে হবে এ সন্ধির শর্তাবলীকে; কিন্তু মহান আল্লাহ একে 'ফাতহুম মুবীন' বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' তথা 'মহা বিজয়' বলে অভিহিত করেন।

আরবদের মনে খোদার ঘর কা'বা শরীফের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রবল। আর মুসলিমদের মধ্যে এ বাসনা ছিল আরো দুর্নিবার। তাই মহানবী (স) ও তাঁর চৌদ্দশত নিবেদিত প্রাণ সাহাবা নিয়ে ৬ষ্ঠ হিজরিতে (৬২৮ খ্রিঃ) যুদ্ধ বিরতির জিলকদ মাসে উমরাহ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। মুসলিমদের কোন সামরিক উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য তাঁরা কোষবদ্ধ একখানা তরবারি ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র-শস্ত্র নেননি। কিন্তু মক্কার কুরাইশগণ মুসলমানদের এ আগমন ঠেকাবার জন্য খালিদ ও ইকরামাকে গতিরোধ করার জন্য পাঠায়। মহানবী (স) 'ওসফান' নামক স্থানে তাঁর খাঁটান। আর বুদাইল-এর মাধ্যমে নিজেদের ওমরাহ হজ্জের ইচ্ছা ও শান্তি প্রস্তাব কুরাইশদেরকে জানান। কিন্তু কুরাইশরা কিছুতেই তাদের উমরাহ পালনার্থে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না বলে ঘোষণা করে।

### দূত বিনিময় ও 'বাই'আতুর রিদওয়ান

পরবর্তী সময়ে মহানবী (স) প্রথমে খারাস ইবনে উমাইয়া এবং পরে হযরত উসমানকে কুরাইশদের সাথে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠান। কিন্তু কুরাইশরা হযরত উসমানকে অন্যায়ভাবে বহুক্ষণ আটকিয়ে রাখে। ফলে গুজব রটে যে, উসমান (রা)-কে তারা হত্যা করেছে। তখন মহানবী (স) নিবেদিত প্রাণ সাহাবীদেরকে একটি বাবলা গাছের নীচে সমবেত করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য 'হাতে হাত রেখে' কঠোর শপথ করান। একে "বাই'আতুর রিদওয়ান" বলা হয়। এতে কুরাইশদের টনক নড়ে। তারা উসমানকে ছেড়ে দেয় এবং সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল এসে দীর্ঘ আলোচনার পর উভয় পক্ষে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি।

### সন্ধির শর্তাবলী

মহানবী (স) ও কুরাইশদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলী নিম্নরূপ :

১. মুসলিমগণ এবছর (৬২৮ খ্রিঃ) হজ্জ না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।
২. পরের বছর হজ্জ করতে পারবে। তবে তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। কুরাইশগণ ঐ তিনদিন নগর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবে।
৩. এ সময় কেবলমাত্র আত্মক্ষার্থে কোষবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র মুসলমানগণ বহন করতে পারবে না।
৪. কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ আগামী দশ বছরের জন্য বন্ধ থাকবে।
৫. যে কোন আরব গোত্র কুরাইশ অথবা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে।
৬. কোন মক্কাবাসী মদিনায় পালিয়ে চলে আসলে তাকে অবশ্যই ফেরৎ পাঠাতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু মদিনাবাসী কেউ মক্কায় আসলে কুরাইশগণ তাকে মদিনায় ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে না।
৭. হজ্জের সময় কুরাইশগণ মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা দেবে। বিনিময়ে মক্কার বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদিনার পথ ধরে সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।
৮. সন্ধির মেয়াদকালে জনসাধারণ পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করবে এবং একে অপরের কোন প্রকার ক্ষতি, লুণ্ঠন ও আক্রমণ করবে না।

৯. হুদাইবিয়ার সন্ধি দশ বছরের জন্য স্থায়ী হবে।

১০. সন্ধির শর্তাবলী উভয় পক্ষ নিজ নিজ দায়িত্বে প্রতিপালন করবে।

### সন্ধির গুরুত্ব বিশ্লেষণ

ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার এ ঐতিহাসিক সন্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ যুগান্তকারী ঘটনা তা নিম্নের বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যাবে :

#### ১. মহা বিজয়

সন্ধির শর্তাবলী আপাত মুসলমানগণের স্বার্থবিরোধী মনে হলেও এরই মধ্যে নিহিত ছিল মুসলমানদের নিকট ভবিষ্যতের মক্কা বিজয়সহ বিশ্ব-বিজয়ের মন্ত্রবাণী। এজন্যই মহান প্রভু একে “ফাতহু মুবীন” বা মহাবিজয় বলে ঘোষণা দেন।

#### ২. রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধি

এ সন্ধি মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং প্রথমবারের মত তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় রাজনৈতিক সংস্থা রূপে লিখিতভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ইমামুদ্দীন বলেন- “চুক্তিটি মুসলমানদেরকে একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় রাজনৈতিক সংস্থারূপে স্বীকৃতি দেয়।”

#### ৩. যুদ্ধাবসান

সন্ধির ফলে ক্রমাগত যুদ্ধবন্দেহী মনোভাবের অবসান ঘটে। হিট্রির মতে- “এ সন্ধি নিজ গোত্র কুরাইশদের সঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যুদ্ধ বিরতির সূচনা করে। ফলে মহানবীর (স) নেতৃত্বে মুসলিমগণ নিজেদেরকে সুসংহত ও প্রশিক্ষিত শক্তিরূপে গড়ে তুলতে পারেন।”

#### ৪. মদিনা রাষ্ট্রের সংহতি

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে মদিনার শিশু রাষ্ট্রটি শান্তি ও স্বস্তির ভাব ফিরে পায়। মহানবী (স) মুসলিমদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদানের সুযোগ লাভ করেন। এতে অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সংহতি গড়ে উঠে।

#### ৫. ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি

এ সন্ধির ফলেই মক্কা ও মদিনার জনগণের মধ্যে পুনঃ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মুসলিমগণ ইসলামের দাওয়াত সারা আরবে ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ পান। সারা আরবের লোকদের সাথে মেলা-মেশার সুযোগে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শের প্রতি সকল শ্রেণীর জনতা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ইসলামের সুশীতল পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণের হার দ্রুত বেড়ে যায়। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আস-এর মত সেরা ব্যক্তিত্ব এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে হিশাম বলেন- “The result of this treaty is that where as Muhammad (sm) went forth to Hudibiyah with only 1400 men, he was followed two years later in the attack on Makkah by ten thousand.” অর্থাৎ মুহাম্মদ (স) যেখানে ১৪০০ লোক নিয়ে হুদাইবিয়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে মাত্র দু'বছর পরে ১০,০০০ লোক নিয়ে মক্কা বিজয় করলেন।”

#### ৬. আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলাম বিস্তার

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম আরবের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তার লাভ করে। মহানবী (স) এ সময় নির্বিঘ্নে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান বাণী সমগ্র আরবসহ বহির্বিশ্বে পৌঁছে দেন। ঐতিহাসিক জে, বি, বুরি বলেন- “এ সন্ধির ফলে রাসূল (স) ইসলামের প্রসার সংগঠিত রূপ দেয়ার জন্য রোম, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে দূত প্রেরণ করতে সক্ষম হন। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে হযরত মুহাম্মদ রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারস্য-সম্রাট খসরু, মিসরের শাসনকর্তা, সুকান্তকাস, আবিসিনিয়ার নাজ্জামী প্রমুখ রাজার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অনেক রাজা-বাদশাহ হযরতের পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

#### ৭. আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে

হুদাইবিয়ার এ সন্ধি মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো মজবুত করতে সুযোগ এনে দেয়। যুদ্ধ বিরতির কারণে মুসলমানগণ অবাধে বর্হিবাহিজ্য এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশের সুযোগ পায়। এ সময় তারা বিধ্বস্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলে।

#### ৮. মক্কা বিজয়ের সূচক

এ সন্ধি মক্কা বিজয়ের সূচনা করে সমগ্র আরব বিশ্বে ইসলামকে বিজয়ী শক্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। হুদাইবিয়ার এ সন্ধিতে কুরাইশগণ প্রকৃত অর্থে মোটেই লাভবান হয়নি। ৬২৮ খ্রিঃ হতে ৬৩০ খ্রিঃ পর্যন্ত মাত্র দু'বছরের মধ্যেই সন্ধির সুফল মুসলমানদের অনুকূলে এত ব্যাপক শক্তি ও সাফল্য বয়ে এনেছিল যে, কুরাইশগণ বিচলিত না হয়ে পারেনি এবং সন্ধি ভঙ্গ করা ছাড়া তাদের গতান্তর ছিল না। এ সুযোগে মহানবী (স) ১০ হাজার মুসলমান নিয়ে মক্কা জয় করে নেন। আর এ থেকেই যাত্রা শুরু হয় মুসলমানদের বিশ্ব বিজয়ের।

#### ৯. কুরাইশদের মানসিক দুর্বলতা

এসন্ধিতে মুসলমানদের সাহসিকতাও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় পেয়ে কুরাইশরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তাদের এ দুর্বলতাই মুসলমানদের জন্য পরবর্তী সময়ে মক্কা বিজয়ের ভিত্তি রচনা করে।

#### ১০. রাসূলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ

সন্ধির ফলে সমগ্র আবরবাসীর কাছে রাসূলের (স) শ্রেষ্ঠত্ব ও দূরদর্শিতা প্রমাণিত হয়েছিল। বিশ্বকোষের পরিভাষায়, “আপাত দৃষ্টিতে মনে হলো মুহাম্মদ (স) অপমানজনকভাবে পশ্চাদপসারণ করেছেন। কিন্তু পরোক্ষভাবে এটা শীঘ্রই প্রকাশ পেলো, সুবিধাগুলো তাঁর দিকেই ছিলো। সত্যি তা ছিল কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপসারণ কিন্তু রণচাতুর্যপূর্ণ বিজয়।” ঐতিহাসিক ওয়াটস বলেন- “হুদাইবিয়ার সন্ধি মহানবী (স)-এর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার একটি শ্রেষ্ঠ দলিল।”

#### মূল্যায়ন

উপরিউক্ত বিশ্লেষণের পর আমরা বলতে পারি যে, এ সন্ধি ইসলামের জন্য ছিল সুমহান বিজয়। এ সন্ধি মহানবীর (স) অনুপম রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। এ সন্ধি সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা) যথার্থই বলেছেন- “হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে ইসলাম সারা আরবসহ গোটা বিশ্বে সার্বজনীনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলাম এক আন্তর্জাতিক জীবনাদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।”

#### সার-সংক্ষেপ

ষষ্ঠ হিজরিতে নবীজী ১৪০০ সাহাবী নিয়ে কা'বা ঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা দেন। কিন্তু পশ্চিমদ্যে কুরাইশদের রণ প্রস্তুতির খবর শুনে রাসূল (স) হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবস্থান করেন। এখানে উভয় পক্ষে আলোচনা করে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন। একে ‘হুদাইবিয়ার সন্ধি’ বলা হয়। যদিও এর শর্তাবলীর অধিকাংশই মুসলমানদের বিপক্ষে ছিল, তবুও কুরআনে একে ‘ফাতহুম সুবীন’ বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়েছে। মূলত এ সন্ধিই মক্কা বিজয়ের পথকে সুগম করেছিল। এ বছর নবীজী বিভিন্ন দেশের প্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। এ বছরই খালিদ ও আমরা ইসলাম গ্রহণ করেন।

#### পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৬

#### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

- পবিত্র কুরআন ফাতহুম সুবীন বা ‘সুস্পষ্ট বিজয়’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে-  
ক. মক্কা বিজয়কে  
খ. হুদাইবিয়ার সন্ধিকে  
গ. বদর যুদ্ধকে  
ঘ. আযাব যুদ্ধকে



২. হুদাইবিয়ার সন্ধি কার হয়েছিল-
- ক. দুই বছরের জন্য  
খ. দশ মাসের জন্য  
গ. দশ বছরের জন্য  
ঘ. তিন বছরের জন্য।
৩. কুরাইশরা হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছিল-
- ক. দুই বছরের মধ্যে  
খ. দশ বছরের মধ্যে  
গ. তিন বছরের মধ্যে  
ঘ. এক বছরের মধ্যে
৪. হুদাইবিয়াতে হযরত (স)-এর সঙ্গী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল-
- ক. ১০ হাজার জন  
খ. ১ লাখ ২৪ হাজার জন  
গ. ১৪০০ জন  
ঘ. ৩১৩ জন

#### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হুদাইবিয়া সন্ধির পটভূমি বর্ণনা করুন।  
২. হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তগুলো কি কি?  
৩. হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলাফল নির্ণয় করুন।  
৪. হুদাইবিয়ার সন্ধির গুরুত্ব ও তাৎপর্য মূল্যায়ন করুন।



## মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ)



### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মক্কা বিজয়ের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা বিজয়ের ঘটনা বিবৃত করতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের বিবরণ দিতে পারবেন
- মক্কা বিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন
- মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



যে মক্কাবাসীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাম্মদ (স) মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গিয়েছিলেন, তারই ঠিক আট বছর পর সে মক্কা নগরীতে মুহাম্মদ (স) প্রবেশ করলেন মহান বিজয়ীর বেশে। যে মক্কা নগরী হতে মুহাম্মদ (স) কোন মতে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সে মক্কাবাসীদের অস্তিত্ব নির্ভর করেছে মুহাম্মদ (স)-এর মজির উপর। মহানবী (স) মক্কা বিজয় করে তাঁর ভূমিতে আল্লাহর দীন ও স্বমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

### মক্কা বিজয়ের কারণ

#### ক. সন্ধি অনুযায়ী মৈত্রী স্থাপন

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর দু'টি বছর কেটে গিয়ে অষ্টম হিজরিতে রমযান মাস আসে। সন্ধির শর্ত ছিল যে, আরবের অন্যান্য জাতি তাদের ইচ্ছামত যে কোন পক্ষের সাথে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে। সন্ধি অনুযায়ী বনী খাযাআ গোত্র রাসূল (স)-এর সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়। বনী বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। খাযাআ ও বকর এ দু'গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ দিনের শত্রুতা ছিল। আর এতেই হল সমস্যা।

#### খ. বনু বকর কর্তৃক বনু খাযাআ গোত্রে হামলা

বনু বকর ও বনু খাযাআ গোত্রের মধ্যে দীর্ঘ দিনের শত্রুতা ছিল। বনু বকর গোত্র প্রতিশোধ নেয়ার উত্তম সময় ভেবে সন্ধির শর্ত উপেক্ষা করে বনু খাযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করলো।

#### গ. বনু বকরের প্রতি কুরাইশদের সাহায্য :

বনু বকর গোত্র যখন অকস্মাৎ খাযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করল, তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সন্ধির কথা ভুলে গিয়ে যুদ্ধ সম্ভার দিয়ে বনু বকর গোত্রের সাহায্য করেছিল। ইকরামা, ছাওয়ান ও সুহাইল রাতের অন্ধকারে মুখোশ পরে বনী বকরের সাথে যোগদান করল।

#### ঘ. হেরেম শরিফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ

বনু বকরের আকস্মিক হামলায় অনন্যোপায় হয়ে খাযাআ গোত্র হেরেম শরীফে আশ্রয় নিল। হেরেম শরিফের মর্যাদা রক্ষা জরুরি মনে করে প্রথমে বনু বকর আক্রমণ হতে বিরত হল। কিন্তু নওফেল বলল, এরূপ সুবর্ণ সুযোগ আর আসবে না। অবশেষে হেরেম শরিফের অভ্যন্তরেই বনু খাযাআর লোকদের হত্যা করা হল। লঙ্ঘন করা হল হেরেম শরিফের পবিত্রতা।

#### ঙ. কুরাইশ কর্তৃক হুদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল ঘোষণা

হযরত মুহাম্মদ (স) এ ঘটনা জানতে পেয়ে অত্যন্ত মর্মান্বিত হলেন। তিনি কুরাইশদেরকে দূত মারফত জানিয়ে দিলেন- “নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের কোনটা তোমরা মেনে নেবে?”

- ১। যুদ্ধে নিহতদের রক্তপণ দেয়া হোক
- ২। বনু বকর গোত্রের সাথে কুরাইশ বনাম বনী বকর মিত্রতা ভঙ্গ করা হোক
- ৩। অথবা, ঘোষণা করা হোক হুদাইবিয়ার সন্ধি ভেঙ্গে গেছে।

কুরাইশরা তৃতীয় শর্তটিই মেনে নিল।

## মক্কা বিজয়ের ঘটনা প্রবাহ

### ক. মহানবী (স)-এর প্রস্তুতি

দূতের কাছে সব কিছু শুনে হযরত মুহাম্মদ (স) বুঝতে পারলেন, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। তিনি অবিলম্বে মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ গোত্রসমূহকে দূত মারফত প্রস্তুত হয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। মক্কাবাসীরা যাতে এ খবর জানতে না পারে সে জন্য পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করা হল। অষ্টম হিজরির ১৮ই রমযান মহানবী (স) ১০ হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। মদিনা বাহিনী যথা সময়ে মক্কার নিকটবর্তী সরবরাজ জহরান উপত্যকায় উপস্থিত হয়ে শিবির স্থাপন করল। আরবদের তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী রাসূল (স) সেনাবাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। এতে সমগ্র মরুভূমি ঝলমল করে উঠল। কুরাইশ প্রধানগণ এ দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল।

### খ. মক্কার দিকে অগ্রসর

সোবেহ সাদেকের সঙ্গে সঙ্গে মরু উপত্যকা আযানের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। মুসলিম বাহিনী শয্যা ত্যাগ করল এবং জামায়াতে ফজর নামায আদায় করল। নামায শেষেই যাত্রার আদেশ হল, ইসলামি সেনাগণ মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হল।

### গ. আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

মরুভূমি ঝলমল করে উঠায় তথ্য জানতে এসে গ্রহরী সৈন্য কর্তৃক আবু সুফিয়ান ধৃত হন। মহানবী (স) আবু সুফিয়ানকে ক্ষমা করে দেন, অবশেষে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে। মুসলমানদের বিশাল বাহিনী দেখে আবু সুফিয়ানের হৃদকম্পন শুরু হয়। সে মহানবী (স)-কে বলে-

“মুহাম্মদ (স) তুমি কি তোমার স্বজনদেরকে (মক্কাবাসী) হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছ?” হযরত (স) উত্তর দিলেন না কখনই নয়। অতঃপর মহানবী আবু সুফিয়ানকে বললেন- আবু সুফিয়ান তুমি গিয়ে মক্কাবাসীদের অভয় দাও- আজ তাদের প্রতি কোন কঠোরতা হবে না, তুমি আমার পক্ষ থেকে ঘোষণা করে দাও :

১। যে ব্যক্তি আত্মমর্পণ করবে, অথবা

২। কাবায় প্রবেশ করবে

৩। যারা নিজেদের গৃহ দ্বার বন্ধ করে রাখবে অথবা

৪। যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, তাদেরকে অভয় দেয়া হল।

### ঘ. মক্কায় মুসলিম বাহিনী

মক্কায় পৌঁছে রাসূল (স) ইসলামের বিজয় পতাকা হনুজ নামক স্থানে উড্ডীন করতে নির্দেশ দিলেন। সৈন্যগণকে নিয়ে উচ্চভূমির দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য হযরত খালেদ (রা) কে আদেশ দিলেন। মহানবী (স) ঘোষণা করলেন, যতক্ষণ কেউ তোমাদের সঙ্গে লড়াই না করবে তোমরা লড়াই করবে না।

### ঙ. সামান্য যুদ্ধ

আবু জাহলের পুত্র ইকরামা ও সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া সৈন্যে তীর নিক্ষেপ আরম্ভ করল। এতে কুরুজ ইবনে জাবের ফেহরী ও খুলাইজ ইবনে খালেদ (রা) শহীদ হলেন। ফলে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ প্রতিশোধ গ্রহণ শুরু করলেন। যুদ্ধ বেঁধে গেল। মুসলমানগণ কাফিরদের মারতে মারতে মসজিদের দরজায় গিয়ে পৌঁছল, এতে ২৪ জন কাফির নিহত হল।

### চ. মহানবী (স)-এর শুকরিয়া আদায়

মহানবী (স) মক্কায় প্রবেশ করার পর আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে শুকরিয়া আদায় করলেন। খানায় কা'বার চতুর্দিকের এবং ভিতরের মূর্তি অপসারণ করা হল। অতঃপর মহানবী (স) কা'বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নামায পড়লেন অথবা তাকবীর দিলেন। মহাসমারোহে আল্লাহর ঘরে অগণিত মানুষ নামায আদায় করল। মহানবী (স) কুরআনের বাণী ঘোষণা করলেন- “সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত আর মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।”

## ফলাফল বিশ্লেষণ

### নির্বিল্পে ইসলাম প্রচার

মহানবী (স)-ও তাঁর সাহাবী মূলসমানগণ এতদিন নির্বিল্পে নিঃশঙ্ক চিত্তে ইসলাম প্রচার করতে পারতেন না। মক্কা বিজয়ের ফলে তিনি এখন আরব উপদ্বীপের একচ্ছত্র নেতা হলেন। নির্বিল্পে ইসলাম প্রচারের ফলে বেদুঈন, পৌত্তলিকসহ মক্কাবাসী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, “এইরূপে মুহাম্মদ (স) তাঁর আশার চরম সীমানায় উপনীত হন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মক্কা একত্ববাদের আলেয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গোটা আরব দেশ মদিনার ইসলামি সরকারের অধীনে আসল।”

### নিশ্চিন্তে বসবাস

শত্রু কুরাইশদের মদিনা আক্রমণের আশঙ্কায় মুসলমানদেরকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হত, কিন্তু এখন আর সে চিন্তা রইল না।

### হজ্জ ও উমরা পালন

মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানদের চিরকালের জন্য হজ্জ, উমরা ও তাওয়াফের সুযোগ সৃষ্টি হল। মক্কা বিজয়ের পর হতে আজ পর্যন্ত এ তিনটি কাজ কোন সময় ব্যাহত হয়নি।

### প্রেম দ্বারা বিজয়ের শিক্ষা

মহানবী (স) রক্ত দ্বারা নয়; বরং ক্ষমা ও প্রেম দ্বারা এ মহাবিজয় সম্পন্ন করলেন। প্রেমের এ বিজয়ের মহান শিক্ষা মুসলমানগণ মহানবী (স)-এর মক্কা বিজয় হতে গ্রহণ করলেন।

### নব উদ্যমে মুসলমানদের তৎপরতা শুরু

মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানগণ নতুন জীবন লাভ করল। তাদের কণ্ঠে ফুটল নতুন ভাষা, বক্ষে জাগল নতুন আশা, আর চক্ষে লাগল অনন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন। তাই মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানগণ নব উদ্যমে তাদের তৎপরতা শুরু করল। যার চেউ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

### মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব নির্ণয়

মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব যেমন গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঠিক তেমনি তা ছিল অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। নিম্নে মক্কা বিজয়ের গুরুত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল :

### দীর্ঘদিনের শত্রুতার সমাপ্তি

সুদীর্ঘ একুশ বছর ধরে অত্যাচার অবিচার, উৎপীড়ন, নিপীড়ন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা মক্কার কুরাইশদের নিকট হতে হযরত মুহাম্মদ (স) ভোগ করে আসছিলেন, এ দিন তার পরিসমাপ্তি ঘটল।

### প্রতিষ্ঠিত জাতি

মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ একটি সুসংগঠিত জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। সমগ্র আরবে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল, আর মহানবী (স) হলেন আরবের একচ্ছত্র নেতা।

### ঐতিহাসিক বিজয়

প্রায় বিনা বাঁধায়, বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, বিনা ধ্বংস বিভীষিকায় মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে এতবড় রক্তপাতহীন মহাবিজয় আর হয়নি। হিট্টি যথার্থই বলেছেন, “প্রাচীন ইতিহাসে এই রক্তপাতহীন মহা বিজয় নজীরবিহীন।

### ক্ষমার ইতিহাসে দৃষ্টান্তহীন নজীর

দীর্ঘ তের বছর ধরে প্রিয় মাতৃভূমি হতে নির্যাতন সহ্য করে পরিশেষে হযরত (স) বহিষ্কৃত হলেন। ৮ বছরের নির্বাসিত অবস্থায় থেকে হযরত আবার বিজয়ী বেশে সেই মাতৃভূমিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য মহানুভবতা, প্রতিশোধ গ্রহণের কোন প্রতিহিংসাই তাঁর মনে জাগল না। মক্কাবাসীকে তিনি ক্ষমা করে বুকে টেনে নেন। তাই উইলিয়াম ম্যুর বলেন, যে লোকেরা এতদিন যাবত মুহাম্মদ (স)কে ঘৃণা করে পরিত্যাগ করেছিল, তাদের প্রতি তাঁর এই উদার ব্যবহার সত্যি প্রশংসনীয়। আমির আলী বলেন, “মহানবী (স) মক্কাবাসীদের প্রতি সার্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করেন। কোন গৃহ লুণ্ঠিত হল না, কোন স্ত্রী লোক অপমানিত হলেন না।” জয়ের সমগ্র ইতিহাসে মক্কা বিজয় তুলনাহীন।

### মিথ্যার উপর সত্যের বিজয়

## মূল্যায়ন

## সার-সংক্ষেপ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৭

১. মক্কা বিজয়ের তারিখ-

- ### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- .....  
 ପୃଷ୍ଠା-୯୧



## মদিনায় উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধ ও ঘটনা



### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- খায়বার বিজয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন
- মূতা অভিযানের বর্ণনা দিতে পারবেন
- হুনাইনের যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন
- তায়েফ বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করতে পারবেন
- তাবুক অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন
- প্রতিনিধি প্রেরণের বছর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

### খায়বার বিজয়



খায়বার বিজয় ইসলামের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায়ের দম্ব চূর্ণ হয়ে যায়। মদিনা হতে নির্বাসিত হয়ে ইহুদি বনু নাযির গোত্র খায়বারে বসতি স্থাপন করে। এখানে এসেই তারা মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে, যার পরিণতিতে সংঘটিত হয় খায়বার যুদ্ধ।

**খায়বার পরিচিতি :** খায়বার শব্দটা সম্ভবত ইরানী শব্দ, এর অর্থ দুর্গ। সিরিয়া প্রান্তরে বিশাল শ্যামল ভূখণ্ডটির নাম খায়বার। স্থানটি মদিনা মুনাওয়ারা হতে আট মঞ্জিল বা ২০০ মাইল দূরে। সিরিয়ার প্রান্তদেশে অবস্থিত হবার কারণে এ স্থানটি বহুদিন যাবৎ ইহুদিদের প্রধানতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়ে আসছিল।

**খায়বার যুদ্ধের কারণ :** ইতোপূর্বে মদিনা রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ইহুদিরা মদিনা হতে বহিস্কৃত হয়। তারা খায়বারে এসে মুসলমান এবং মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তারা মদিনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোপন আক্রমণ ও লুণ্ঠতরাজ শুরু করে। তাদের উস্কানীতে গাতফান গোত্রের একদল লুটেরা রাসূল (স)-এর চারণ ক্ষেত্রে আক্রমণ চালিয়ে ২০টি উট লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়।

ইতোমধ্যে ইহুদি বনু কাইনুকা ও বনু নযীর তাদের সাথে মিশে ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ জোরদার করে। রাসূল (স) আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার আহবান জানান। সন্ধির শর্ত নির্ধারণের জন্য তারা ওসায়েবকে মদিনায় পাঠায়। ওসায়েব মদিনায় এসে উস্কানীমূলক কাজ করে। এক পর্যায়ে তারা কৌশলে মুসলিম সেনা আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়েসের নিকট হতে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়। এতে উভয় পক্ষের যুদ্ধে ইহুদি প্রতিনিধি ওসায়েব নিহত হয়।

**খায়বার যুদ্ধের ঘটনা :** ইহুদিরা ইতোপূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রত্নুতি নিয়েছিল। ওসায়েবের হত্যা ঘটনাকে উপলক্ষ করে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্ণপ্রত্নুতি গ্রহণ করে। ইহুদিদের রণ প্রত্নুতির খবর পেয়ে রাসূল (স) ৭ম হিজরির মুহাররম মাসে ১৬০০ মুজাহিদ নিয়ে খায়বার অভিমুখে রওয়ানা করেন। মুসলিম মুজাহিদগণ সর্বপ্রথম ইহুদিদের নায়েম দুর্গ দখল করে নেন। এখানেই থাকত আরবের বিখ্যাত যোদ্ধা মারহাব। তুমুল যুদ্ধের পর হযরত আলী কামুস দুর্গ দখল করেন। অতঃপর আরো কয়েকটা ছোট খাট দুর্গ মুসলমানরা দখল করে নেন।

**যুদ্ধের ফলাফল :** এ যুদ্ধে মুসলমানগণ জয় লাভ করেন। ইহুদিরা চরমভাবে পরাজয় বরণ করে। যুদ্ধে ইহুদিদের ৯২ জন নিহত এবং মুসলমানদের ১৫ জন শাহাদত বরণ করেন।

খায়বারের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। এ যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ী রণাভিযানের সূত্রপাত ঘটে। খায়বারের যুদ্ধ প্রমাণ করল যে, ইসলাম শুধু আরববাসীদের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের বিজয়ী মতাদর্শ। সার্বিক বিচারে এ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসের এক অনন্য সাধারণ ঘটনা।

### মূতা অভিযান

মূতা অভিযান ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। অষ্টম হিজরিতে সিরিয়া সীমান্তে রোমান সামন্ত রাজ্য বসরার অধিপতি শোরাহবিল ইবনে আমরের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে নবী করীম (স) এক দূত পাঠান। শোরাহবিল তাঁকে হত্যা করে। মহানবী (স) দূত হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যায়েদ ইবনে হারিসার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক অভিযান প্রেরণ করেন।

**ঘটনা ৪** শোরাহবিল তার রোমান সম্রাটের সাহায্যে লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে মূতা নামক স্থানে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ ভীষণ যুদ্ধে মহানবী (স) কর্তৃক নিযুক্ত তিনজন সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পরপর শাহাদাত বরণ করেন। তারপর মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ বীর বিক্রমে ওদের মোকাবিলা করেন। শোরাহবিলের লক্ষাধিক সুসজ্জিত সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী বিজয়ী হয়। খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বীরত্বে মর্যাদা স্বরূপ মহানবী (স) তাকে 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

**মূল্যায়ন ৪** এ যুদ্ধে বিজয় ছিল মুসলমানদের আন্তর্জাতিক শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়। মুসলমানদের মনে এ যুদ্ধ নব চেতনা ও উৎসাহের সঞ্চার করেছিল।

### হুনায়েনের যুদ্ধ (৬৩০ খ্রি.)

হাওয়াযিন নামক একটি শক্তিশালী বেদুঈন গোত্র বহুদিন যাবত হযরতের (স) বিরুদ্ধাচরণ করে আসছিল। মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তায়েফের নিকটবর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চলে ছিল তাদের বসতি। নানা শাখা প্রশাখায় তারা পল্লবিত হয়েছিল। কুরাইশদের ন্যায় এরাও ছিল পৌত্তলিক। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত নানাভাবে এরা আরবের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করে আসছিল। এতদিন মক্কা ছিল কুরাইশদের হাতে। তাই তারা নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করত, কিন্তু যখন দেখল মুহাম্মদ (স) মক্কা জয় করে নিয়েছেন এবং কুরাইশ ও অন্যান্য পাশ্বেবর্তী গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করেছে, তখন তারা বিপদে পড়ল। মুসলমানগণ তাদেরকেও আক্রমণ করতে পারে এ আশঙ্কায় তারা কালবিলম্ব না করে মহানবী (স)-এর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আয়োজন করে। তায়েফের বনী সাকীফ গোত্রও হাওয়াযিনদের সাথে যোগ দেয়, মুসলিমগণ তাদেরকে আক্রমণ করতে পারে এ আশঙ্কায় তারা কালবিলম্ব না করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়।

এ সংবাদ মহানবী-এর নিকট আসলে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য হুনায়েন উপত্যকায় ১২০০০ (বার হাজার) সৈন্য নিয়ে অভিযান চালালেন। শত্রু সৈন্যরা হুনায়েন উপত্যকায় সমবেত হয়েছিল। এবার মুসলমানদের সংখ্যা শত্রু সংখ্যা হতে অধিক ছিল। তারা সর্বমোট ছিল বার হাজার, তন্মধ্যে দশ হাজার মুহাজির। তবুও মুসলমানরা পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে নিতে বাধ্য হত, যদি না আল্লাহর সাহায্য আসত। মুসলমানগণ কেউ কেউ অন্তরে অন্তরে নিজেদের সংখ্যাধিক্যের উপর অধিক নির্ভর করেছিল। তারা মনে করেছিল, সংখ্যায় অধিক হলে যুদ্ধ জয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। অথচ পূর্বের সমস্ত যুদ্ধে মুসলমানরা শত্রুদের তুলনায় অতি অল্প হয়েও বারবার জয়ী হয়ে আসছিলেন। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের উপর ভরসা করে তাঁরা আদর্শের এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার প্রতি অবিচার করছিল। আল্লাহর নিকট এমন চিন্তা ছিল অপছন্দনীয়। তাই তাঁদের মনে ভয়-ভীতির উদ্বেক হল এবং শত্রুদের হামলায় তাঁরা বিচলিত হয়ে পশ্চাদপসরণ শুরু করলেন। এমন সময়ে আল্লাহর নামে হযরত (স)-এর বজ্রকণ্ঠের হুকুমে তারা সন্নিহিত ফিরে পেল এবং লজ্জিত হয়ে ফিরে এসে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে শত্রু সৈন্যকে হটিয়ে দিল। এ যুদ্ধে সফলতার পর হযরত তায়েফ অধিকার করেন।

### তায়েফবাসীর ইসলাম গ্রহণ

হুনায়েনের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে হযরত মুহাম্মদ (স) আবু মুসার অধিনায়কত্বে একটি বিশাল মুসলিম বাহিনী তায়েফে প্রেরণ করেন। যে তায়েফবাসী একদিন মহানবী (স)-কে প্রস্তর আঘাতে জর্জরিত করেছিল, মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে তারা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল এবং মহানবী (স)-এর আনুগত্য স্বীকার করল, দীক্ষিত হল ইসলামে।

### তাবুক অভিযান (৬৩১ খ্রি.)

রাসূল (স)-এর সংগ্রামী সর্বশেষ সামরিক অভিযান তাবুক বিজয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির অধিকারী ও পরাশক্তি রোমানদের দম্ভকে চূর্ণ করে দেন। বস্তৃত তাবুক যুদ্ধ ছিল ইসলামের এক নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনা। এ যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ধারা আরব ভূখণ্ড হতে বহির্বিশ্বে সম্প্রসারিত হয়।

### তাবুক অভিযানের কারণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূল (স) আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের দাওয়াতকে পৌঁছে দেয়ার অংশ হিসেবে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট দূত প্রেরণ করেন। হিরাক্লিয়াস রাসূলের (স) দূতকে সাদর সম্ভাষণ জানালেও ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকেন। ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে মুসলমানদের ভূখণ্ড আরব জয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এদিকে রাসূল মক্কা ও তায়েফ জয় করে গোটা আরব দেশে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখলে হিরাক্লিয়াস যার পর নেই ক্রোধান্বিত হন। এদিকে মৃত্যুর প্রান্তরে তার সৈন্যবাহিনী সংখ্যালঘু মুসলিম সেনাদের মুকাবিলায় পরাজয় বরণ করলে হিরাক্লিয়াসের প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয়। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে

বৃহত্তর সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। ইতোমধ্যে ইহুদিরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ব্যাপারে হিরাক্লিয়াসকে উৎসাহিত করে। এসময় সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে লক্ষাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। হিরাক্লিয়াসের সেনা সমাবেশের খবর পেয়ে রাসূল (স) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ফলে তাবুক যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

### রাসূল (স)-এর রণপ্রস্তুতি

রাসূল (স) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের জন্যে সর্ববৃহৎ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বিশ্বের পরাশক্তির বিরুদ্ধে সামরিক বিজয়ের পরিকল্পনায় তিনি প্রায় অর্ধলক্ষ (কোন বিবরণে ৩০ হাজার) সৈন্যের বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। সামরিক ব্যয় মেটানোর জন্যে তিনি সাহাবীদের নিকট অর্থ দানের আহবান জানান।

রাসূল্লাহ (স)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে হযরত আবু বকর (রা) তার অর্জিত সম্পদের সর্বস্ব এবং হযরত উমর (রা) তার সমুদয় সম্পদের অর্ধাংশ দান করেন। হযরত উসমান (রা) এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এক হাজার উট এবং ৭০টি ঘোড়া সামরিক তহবিলে দান করেন। এভাবে তাবুক যুদ্ধের জন্যে বিরাট প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়।

### তাবুক অভিযান

৯ম হিজরি ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে রাসূল (স) বিশাল সেনাবাহিনীসহ কঠিন গ্রীষ্মের খরতাপের মধ্য দিয়ে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী তাবুক প্রান্তরে পৌঁছেন। বিগত সালে রোমানদের লক্ষাধিক সৈন্যের বড় ধরনের বাহিনী মৃত্যু মাত্র তিন হাজার মুসলিম সেনার নিকট পরাজিত হয়েছিল। অথচ এবার বিশাল বাহিনী এবং তার নেতৃত্বে স্বয়ং মহানবী (স) উপস্থিত। এসব খবর পেয়ে রোমান সম্রাট ভীত হয়ে পড়েন। মুসলমানদের এহেন বিরাট আয়োজন ও সাহস দেখে রোমান বাহিনী মোকাবিলার সাহস পেল না; বরং তারা যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে পলায়ন করে।

তাবুক প্রান্তরে প্রায় বিশ দিন যাবত রাসূল (স) অবস্থান করে অবশেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিনা যুদ্ধে রাসূল (স) রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয় অর্জন করেন।

### তাবুক অভিযানের ফলাফল

তাবুক অভিযান মুসলিম ও রোমান বাহিনীর মুখোমুখি লড়াই হয়নি; বরং রোমানরা মুসলিম বাহিনীর সামরিক আয়োজনে ভীত হয়ে পলায়ন করে। মুসলমানরা রক্তপাতহীন ভাবে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেন। পক্ষান্তরে খ্রিস্টান রোমান বাহিনী রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে পরাজয় বরণ করেন।

বিশ্ব বিজয়ে তাবুকের সফল অভিযান ইসলামের ইতিহাসের একটা মাইল ফলক। তৎকালীন পৃথিবীর পরাশক্তি (Super Power) রোম যে ইসলামের মুকাবিলায় নিত্যন্ত দুর্বল তাবুকের অভিযান তার প্রমাণ বহন করে। সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়বার জন্য মুসলমানরা তাবুক অভিযান হতে প্রেরণা গ্রহণ করেন।

#### সার-সংক্ষেপ

**খায়বার বিজয়ঃ** যে সমস্ত ইহুদিকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে মদিনা হতে বহিষ্কার করা হয়- তারা মদিনা থেকে দু'শ মাইল উত্তর পূর্বে অবস্থিত খায়বারে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা সেখান থেকে রাসূলের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ এদেরকে দমনের জন্যে ৭ম হিজরিতে ১৬০০ সৈন্য নিয়ে অভিযান চালায় এবং ইয়াহুদিদের দুর্গগুলো দখল করেন। তুমুল সংঘর্ষের পর তারা আত্মমর্পণ করে ও ক্ষমা চায়। রাসূল তাদেরকে ক্ষমা করে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয় এতে তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

**মুতার যুদ্ধঃ** রোমীয় সামন্তবাজ শোরাহবীল রাসূলের দূতকে হত্যা করে ৮ম হিজরিতে রাসূল (স) যায়েদ বিন হারিসার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য পাঠান। রোমান সৈন্য সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। তুমুল যুদ্ধে তিনজন সেনাপতি যথাক্রমে যায়েদ বিন হারিস, জাফর ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা শহীদ হন। পরে খালিদ-বিন ওয়ালিদের সেনাপতিত্বে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে। খালিদের বীরত্বে খুশী হয়ে রাসূল (স) তাঁকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারি উপাধি দান করেন।

**হুনাইন যুদ্ধঃ** মক্কা বিজয়ের পর হাওয়াহিন ও সকীফ গোত্রদ্বয়ের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য রাসূল (স) ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে ৬০০ খ্রিস্টাব্দে তায়েফ অভিযান করেন। নবদীক্ষিত ও অপরিপক্ক মুসলিম বাহিনীর কিছুটা অহংকার ও অবহেলায় প্রথম দিকে যুদ্ধে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে। পরে রাসূলের দৃঢ় নেতৃত্বে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং বিজয় লাভ করে।

**তাবুক অভিযানঃ** ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মদিনা আক্রমণের খবর পেয়ে রাসূল তাকে প্রতিহত করার জন্য নিজের নেতৃত্বে সিরিয়ার তাবুকে উপস্থিত হন। রাসূলের স্বয়ং অভিযানের কথা জানতে পেরে রোমান সম্রাট ভীত



হয়ে পশ্চাদসরণ করেন। ফলে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। রাসূল (স) সেখানে বিশ দিন অবস্থানের পর মদিনায় ফিরে আসেন।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৮

#### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. মদিনা হতে নির্বাসিত হয়ে যে ইহুদি গোত্র খায়বারে আশ্রয় গ্রহণ করে-  
ক. বনু নাযির খ. বনু কাইমুকা গ. বনু কুরায়জা ঘ. বনু তাইম
২. মুসলিম বাহিনীর পর পর তিন জন সেনাপতি শহীদ হন-  
ক. তাবুক যুদ্ধে খ. মূতা যুদ্ধে গ. খায়বার যুদ্ধে ঘ. হুনাইন যুদ্ধে
৩. মূতা যুদ্ধে পরপর শহীদ তিনজন সেনাপতির নাম-  
ক. য়ায়েদ বিন হারিস, জাফর, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াছাহ  
খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ, য়ায়েদ, জাফর  
গ. য়ায়েদ, জাফর, তারেক ঘ. বিলাল, খালিদ, জাফর।
৪. 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবারি) কার উপাধি?  
ক. য়ায়েদ-বিন-হারিসার (রা) খ. হযরত আলীর (রা)  
গ. খালিদ-বিন-ওয়ালিদের (রা) ঘ. আবদুল্লাহ-বিন-রাওয়াহার (রা)
৫. সৈন্য সংখ্যার সংখ্যাধিক্য যুদ্ধ জয়ের জন্য যথেষ্ট নয়- মুসলমানগণ শিক্ষা লাভ করে-  
ক. উহুদ যুদ্ধে খ. হুনাইন যুদ্ধে গ. বদর যুদ্ধে ঘ. তাবুক যুদ্ধে।
৬. তাবুক যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল-  
ক. ত্রিশ হাজার খ. বিশ হাজার গ. তিন হাজার ঘ. চার হাজার
৭. রোমান সম্রাট হিরা-ক্লিয়াস মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানে এসেও ভীত হয়ে পলায়ন করেছিলেন-  
ক. মূতা যুদ্ধে খ. তাবুক গ. হুনাইন ঘ. বদর

#### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খায়বার বিজয়ের বর্ণনা দিন।
২. মূতা যুদ্ধের বিবরণ দিন।
৩. হুনাইন যুদ্ধে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৪. তাবুক অভিযানের বিবরণ দিন।
৫. তাবুক অভিযানের কারণ বিশ্লেষণ করুন।
৬. তাবুক অভিযানের ফলাফল নির্ণয় করুন।



## মদিনার ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সম্পর্ক



### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবীর ইহুদি গোত্রদের সাথে সম্পর্ক সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন
- মহানবীর (স) সাথে ইহুদিদের সম্পর্ক মূল্যায়ন করতে পারবেন
- ইহুদিদের প্রতি রাসূলের পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- মহানবীর (স) ইহুদি নীতি পর্যালোচনা করতে পারবেন
- মহানবী (স)-এর সাথে খ্রিস্টানদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



### ইহুদি গোত্রসমূহের সাথে রাসূলের (স) সম্পর্ক

৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনাবাসীদের আহবানে রাসূল (স) মদিনায় হিজরত করেন। অতঃপর জীবনের বাকি অংশ মদিনাতেই কাটিয়ে দেন। মদিনায় অবস্থান কালীন সময়ে মদিনার সকল শ্রেণীর ও জাতির সাথে রাসূল (স) সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। রাসূলের মদিনায় আগমনের প্রাথমিক পর্যায়ে তথাকার ইহুদি-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকলেই তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। মদিনায় অবস্থান কালীন সময়ে তথাকার ইহুদি গোত্রের সাথে মহানবীর সম্পর্ক কিরূপ ছিল সে বিষয়ে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো-

**মদিনার ইহুদি গোত্রসমূহ :** রাসূল (স) যখন মদিনায় আগমন করেন, তখন মদিনায় প্রধানত তিনটি জাতির অস্তিত্ব ছিল। যথা : ১. মুশরিক, ২. ইহুদি ও ৩. খ্রিস্টান।

মুশরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আউস ও খায়রায় গোত্র ছিল প্রধান। আর ইহুদিদের তিনটি পৃথক উপগোত্র ছিল। উপগোত্রগুলো হলো- ১. বনু কাইনুকা, ২. বনু নাযীর ও ৩. বনু কুরাইযা।

**সুসম্পর্ক স্থাপন :** রাসূলের আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদিগণ তাদের ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে একজন বিশ্ববীর আগমনের কথা অবগত ছিল। মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তারা তাঁকে প্রতিশ্রুত বিশ্বনবী হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের মধ্যে পাবার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে।

রাসূল (স) মদিনায় আগমন করে যথারীতি ইহুদি গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ইহুদিরা রাসূলের মদিনা আগমনকে স্বাগত জানায় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে প্রীত হয়।

**সমমর্যাদাভিত্তিক সনদ স্থাপন :** মদিনার সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জন ও বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষার জন্য রাসূল (স) মদিনার সকল গোত্রসমূহকে সমান মর্যাদা প্রদান করে একটি সনদ কয়েম করেন। এ সনদ দ্বারা সকল গোত্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত হয়। তদুপরি এ মর্মে চুক্তি হয়- মুসলমান ও ইহুদিরা পরস্পর বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে অবস্থান করবে, একে অপরকে আক্রমণ করবে না, কেউ আক্রান্ত হলে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে তা মুকাবিলা করা হবে। এটাই মদিনা সনদ নামে প্রসিদ্ধ।

**ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা :** রাসূল (স)-এর মদিনা আগমনের প্রাথমিক অবস্থায় ইহুদিরা আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। কারণ, তারা রাসূল (স)-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জনের প্রত্যাশা করত। কিন্তু যখন তারা দেখলো মুহাম্মদ (স) ইসলামি জীবন ব্যবস্থাকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠার সার্বিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তখন তারা বৈক্যে বসে। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা গোপনে ইসলামের মূলশত্রু কুরাইশদেরকে মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার আহবান জানায়। মদিনা সনদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা ইসলামের অস্তিত্ব বিপন্ন করার প্রচেষ্টায় মেতে ওঠে।

### ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষায় রাসূল (স)-এর দৃঢ় অবস্থান

একদিকে ঘরের শত্রু মদিনার ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা, অপরদিকে আরবের ইসলাম বিরোধী চক্রের ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে রাসূল (স) আপোসহীন সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসলাম বিরোধীদের মুকাবিলা করেন।

রাসূল (স)-এর মদিনায় আগমনের পর প্রধানত কুরাইশদের নেতৃত্বে বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী অভিযানে ইহুদিরা ইন্ধন যোগানো ছাড়াও তারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম ও মুহাম্মদ (স)-এর অস্তিত্ব নির্মূলের জন্য নানা তৎপরতা চালালে মুহাম্মদ (স) তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। এসব ঘটনা প্রবাহ নিম্নরূপ-

ক. বনু কাইনুকা সম্প্রদায় : ইহুদিদের অন্যতম সম্প্রদায় বনু কাইনুকা সর্বপ্রথম মদিনা সনদ ভঙ্গ করে। কুরাইশদের পরিচালিত ইসলামের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধ বদরের প্রান্তরে কুরাইশদের চরম পরাজয় আর মুসলমানদের বিজয় দেখে বনু কাইনুকা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। তারা প্রকাশ্যে রাসূল (স) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। মদিনা সনদের স্পষ্ট লংঘন ও বিশ্বাসঘাতকতা তদুপরি রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধ করে। সর্বোপরি ইসলামের অস্তিত্ব সংরক্ষণের পথে বাঁধা বিদূরিত করার ব্যবস্থা স্বরূপ রাসূল (স) কাইনুকা সম্প্রদায়কে মদিনা হতে বের করে দিলেন। তাদের নেতা কার্বকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

খ. বনু নাযীর গোত্র : বনু কাইনুকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রদত্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেখার পরও ইহুদিদের অপর গোত্র বনু নাযীর ইসলাম বিরোধী তৎপরতা চালাতে থাকে। তাদের এ অপতৎপরতার এক পর্যায়ে তারা রাসূল (স)-কে হত্যা করার এক বার্থ প্রচেষ্টা চালায়। এহেন অপতৎপরতার বিচারস্বরূপ রাসূল (স) এক খণ্ড যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে মদিনা হতে বহিষ্কার করেন।

গ. বনু কুরাইয়া গোত্র : বনু কুরাইয়া গোত্র ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মদিনার সর্বশেষ ইহুদি গোত্র। উহুদ যুদ্ধের সময় তারা ইসলাম বিরোধীদের সাথে গোপন আঁতাত করেছিল। পরবর্তী সময়ে তারা মুসলমানদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিলে রাসূল (স) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু কুরাইয়া আবার বিশ্বাসঘাতকতা করে কুরাইশ বাহিনীতে যোগদান করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। ঘরের শত্রু বিভীষণ হিসেবে তারা দুনিয়া থেকে ইসলামের অস্তিত্ব মুছে ফেলার অপতৎপরতায় মেতে ওঠে। খন্দকের যুদ্ধে বনু কুরাইয়ার মিত্র কুরাইশ বাহিনী পালিয়ে গেলে রাসূল (স) আল্লাহর নির্দেশে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিচার করতে মনোযোগী হন এবং তাদেরকে দীর্ঘকাল অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে বনু কুরাইয়ার মনোনীত বিচারক হযরত সাদ (রা) বিচারে মদিনা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও প্রকাশ্য তৎপরতা এবং বহিঃশত্রুর মদদ দেয়ার অপরাধে তাদের তিন/চারশত পুরুষের মৃত্যু দণ্ডদেশ দিলেন।

### রাসূল (স)-এর ইহুদি নীতির পর্যালোচনা

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ রাসূল (স)-এর ইহুদি নীতির সমালোচনা করেছেন। তারা বিশেষ করে ইহুদি গোত্রসমূহকে মদিনা হতে বহিষ্কার ও বনু কুরাইয়ার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের কঠোর সমালোচনা করেন। তাদের সমালোচনার জবাবে বলা যায় যে, রাসূল (স) তাদের সাথে সন্ধ্যাবহারের জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তারা বরাবর রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মূলক কাজ করত। তারা মদিনা সনদে স্বাক্ষর করলেও বহিঃশত্রুকে সহযোগিতা করে। এভাবে দেশদ্রোহীতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য রাসূল (স) ইহুদিদের বনু কাইনুকা ও বনু নাযীর সম্প্রদায়কে মদিনা হতে বহিষ্কার করেন। দেশদ্রোহীতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডদেশ প্রদান না করে তাদেরকে শুধুমাত্র মদিনা হতে নির্বাসিত করে তিনি মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বনু কুরাইয়া গোত্রের কিছুসংখ্যক লোককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো মদিনার চরম দুর্দিনে খন্দকের যুদ্ধে তারা মদিনা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বহিঃশত্রুকে সরাসরি সহযোগিতা করেছিল। ঐতিহাসিক লেনপুল স্বীকার করেছেন, “এটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মদিনা নগর অবরোধের সময় এসব লোক (বনু কুরাইয়া) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতার অপরাধে অপরাধী ছিল।”

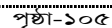
দেশদ্রোহীতার সর্বজনবিদিত শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। তথাপি বনু কুরাইয়াকে রাসূল (স) স্বয়ং মৃত্যু দণ্ডদেশ দেননি, বরং তাদেরই নির্বাচিত বিচারক তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডদেশ দিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে একই ধরনের অপরাধে মহানবী বনু কাইনুকা ও বনু নাযীরকে শুধুমাত্র নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং এ হিসেবে বনু কুরাইয়া গোত্রের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডদেশ প্রদানে রাসূল (স)-এর সমালোচনা করা যায় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইহুদিরা রাসূল (স), ইসলাম ও মদিনার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ষড়যন্ত্র মূলক কার্যক্রম চালিয়েছিল। তারা অনেকবার রাসূলের (স) প্রাণনাশের চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের অপরাধের তুলনায় রাসূল (স) কর্তৃক ইহুদিদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তি নগণ্য ছিল। যে কোন দিক বিচারে রাসূল (স) কোন অন্যায় কাজ করেননি। ঐতিহাসিক ম্যুর বলেন-The ostensible ground for which Mohammad (sm) punished the jews was political and not religious. অর্থাৎ “যে কোন কারণে মুহাম্মদ (স) ইহুদিগণকে শাস্তি প্রদান করেন, তা রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নয়।”

### হযরত মুহাম্মদ (স) এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সম্পর্ক

বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক : খ্রিস্টানদের সাথেও মহানবী (স) সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান সম্রাট নাজ্জাশী দুর্দিনে মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে কথা তিনি ভুলে যাননি। মদিনায় হিজরতের পরও সম্রাট নাজ্জাশী মহানবীর (স) সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখেন। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) দক্ষিণ ও মধ্য আরবের অনেক খ্রিস্টান জাতির সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হন। অনেক খ্রিস্টান জাতি তাঁকে জিজিয়া কর





চিত্র- ১১ : আরব দেশ - হযরত মুহাম্মদ (স) এর সময়



## বিদায় হজ্জের ভাষণ (৬৩২ খ্রি.)



### উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিদায় হাজ্জের বিবরণ দিতে পারবেন
- বিদায় হাজ্জের বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারবেন
- বিদায় হাজ্জের ভাষণের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।



মক্কা বিজয়ের পর মহানবীর আমন্ত্রণক্রমে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য প্রতিনিধি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদিনায় আসতে আরম্ভ করলে মুহাম্মদ (স) বুঝতে পারলেন তার মিশন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে এবং তিনিও জীবন সয়াহে উপস্থিত হয়েছেন। তাই জীবনের এই গোখুলি লগ্নে মুসলিম মিল্লাতকে বিদায়ী হেদায়াত দানের পরিকল্পনা করেন। তিনি আয়োজন করেন এক মহাসম্মেলনের। ইসলামের ইতিহাসে এটাই বিদায় হজ্জ।

### বিদায় হজ্জের ঘটনা

**পরিকল্পনা গ্রহণ :** সুদীর্ঘ তেইশ বছরে অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র আরব ভূমিকে ইসলামের পতাকা তলে দিয়ে আসেন মুহাম্মদ (স)। রাসূল (স) বুঝলেন তাঁর রিসালাতের মিশন প্রায় শেষ। মৃত্যুর আর বেশিদিন বাকি নেই বুঝতে পেরে তিনি মক্কায় সমাপনী হজ্জ পালন ও মুসলিম মিল্লাতের একটা মহাসমাবেশের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

**খ. হজ্জ যাত্রা :** পরিকল্পনা মূতাবেক রাসূল (স) দশম হিজরির ২৫ জিলকদ তারিখে মক্কা যাত্রা করলেন। তাঁর সাথে চললেন লক্ষাধিক মুসলমান।

**গ. হজ্জ পালন :** লক্ষাধিক মুসলমান সঙ্গে নিয়ে রাসূল (স) জন্মভূমি মক্কায় হজ্জ পালন করলেন। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের কণ্ঠে ইসলামের জয়ধ্বনি উচ্চারিত হতে থাকল। সর্বশেষে আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে মহানবী (স) সমবেত ও অনাগত মুসলমানদেরকে লক্ষ করে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তাঁর এ ভাষণকে বিদায় হজ্জের ভাষণ বলা হয়।

### আরাফাত ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ

মহানবী (স) ৮ জিলহজ্জ ঐতিহাসিক আরাফাত ময়দানের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের তরঙ্গায়িত জন-সমুদ্রে দাঁড়িয়ে ভাষণ শুরু করলেন। তাঁর ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে পেশ উল্লেখ করা হলো-

**ক. আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা :** শুরুতে রাসূল (স) আল্লাহর প্রশংসা ঘোষণা করলেন এবং তাঁর প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত রহমতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

**খ. মনযোগ আকর্ষণ :** সমবেত মানুষদের মনযোগ আকর্ষণ করে রাসূল (স) বলেনঃ “হে মুসলমানগণ, মনযোগ সহকারে আমার বাণী শ্রবণ কর। কারণ, পুনরায় তোমাদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ আল্লাহ আমাকে নাও দিতে পারেন।”

**গ. জীবন ও সম্পদের পবিত্রতা ঘোষণা :** রাসূল (স) বলেন- মনে রেখ এ সন ও এ মাস সকলের জন্য যেকোন পবিত্র, সেরূপ তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত পরস্পরের নিকট পবিত্র ও হস্তক্ষেপের অনুপযুক্ত।

**ঘ. জবাবদিহির অনুভূতি দৃষ্টি :** স্মরণ রেখ দুনিয়ার প্রতিটি কাজের জন্য এক আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তোমাদেরকে নিজেদের সকল কাজের জবাবদিহি করতে হবে।

**ঙ. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার :** হে ভক্তগণ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেকোন অধিকার আছে, তোমাদের উপরও তাদের তেমনই অধিকার রয়েছে। আল্লাহকে স্বাক্ষী রেখে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং তাঁরই আদেশ মত তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করে নিয়েছ। সুতরাং তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।

**চ. আমানত হিফায়ত করার দায়িত্ব :** হে মুসলমানগণ! তোমরা সবসময় অন্যের আমানত হিফায়ত করবে এবং পাপকাজ হতে বিরত থাকবে।

**ছ. সুদপ্রথা নিষিদ্ধ :** জেনে রেখ, সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ। খাতকের নিকট থেকে কেবল মাত্র আসল অর্থ ফেরত নিবে।

**জ. জাহিলিয়াতের বিলুপ্তি ঘোষণা :** জাহিলিয়া যুগের সমস্ত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধরীতি আজ থেকে বাতিল ঘোষণা করা হলো। রক্তের বদলে রক্তপাত নীতি নিষিদ্ধ হলো।

ঝ. দাস-দাসীদের অধিকার : দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার কর, যে বস্ত্র পরিধান কর তাদেরকেও অনুরূপ খাদ্য ও বস্ত্র দান করবে। তারা যদি ক্ষমার অযোগ্য কোন আচরণ করে, তাহলেও তাদেরকে মুক্তি দান করবে। স্মরণ রেখ, তারাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তোমাদের মত মানুষ।

ঞ. শিরক ও পাপাচার হতে নিষেধাজ্ঞা : তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকেও অংশীদার করো না, পরের দ্রব্য আশ্রয় ও অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না এবং কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না।

ট. মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব : হে মুসলমানগণ, আমার বাণী মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করার চেষ্টা কর। স্মরণ রেখ, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। দুনিয়ার সমগ্র মুসলিম একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে জাতি সত্তায় আবদ্ধ। অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো কোন জিনিস জোর করে নিতে পারবে না।

ঠ. বর্ণবাদের বিলুপ্তি : জেনে রেখ, অঞ্চল ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান সমপর্যায়ভুক্ত। আজ হতে বংশগত কৌলিন্য প্রথা বিলুপ্ত হলো। সেই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক কুলীন, যে স্থায়ী কাজের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আগ্রহী।

ড. ধর্ম প্রচারের সীমা : সাবধান, তোমরা ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করো না। বলপূর্বক তোমাদের ধর্ম অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করো না। ধর্ম প্রচারের উন্মাদনা দুনিয়ায় বহু রক্তপাত ও অনেক জাতির ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

ঢ. ফৌজদারী আইন : প্রত্যেক মানুষ তার নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা চলবে না। তেমনিভাবে পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে অথবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না।

ণ. ভবিষ্যৎ পথদ্রষ্টা : ভবিষ্যতে সঠিক পথের দিশা দানকারী হিসেবে তোমাদের জন্য কুরআন মাজীদ ও আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের জীবনাদর্শ হাদীস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দুটোর অনুসরণ করবে, ততদিন তোমরা পথদ্রষ্ট হবে না।

ত. দাওয়াত সম্প্রচারের আহবান : হে আমার উম্মতগণ, যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে তারা অনুপস্থিত সকল মুসলমানদের নিকট আমার উপদেশ পৌঁছে দেবে। যারা অনুপস্থিত তাদেরকে আমার উপদেশের কথা জানাবে উপস্থিত ব্যক্তিগণের চেয়ে তারাই অধিক স্মরণ রাখতে পারবে।

পরিশেষে মুহাম্মদ (স) আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত উঠিয়ে বললেন- হে আল্লাহ আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি? উপস্থিত জনতা জবাব দিলেন- নিশ্চয়ই আপনি পেরেছেন। রাসূল (স) তখন বলেন, হে প্রভু। সাক্ষী থেকে। তখন আল্লাহ ওহী পাঠালেন-

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামতও পূর্ণ করলাম, আর জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।’

### বিদায় হজ্জের গুরুত্ব :

ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। রাসূল (স)-এর এ ভাষণের মাধ্যমে মানব জাতির একটা পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধানের সার-সংক্ষেপ বিধৃত হয়েছে। ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, ফৌজদারী, নারী ও দাসদাসীর অধিকারের একটা বাস্তবসম্মত সনদ প্রকাশ লাভ করেছে। এর আলোকে মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির এক আলোকদীপ্ত ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান বিশ্বের সংঘাতময় পরিবেশ পরিস্থিতির শান্তি ময় সমাধানে তাঁর ভাষণ খুবই বাস্তবসম্মত।

পরিশেষে বলতে হয়, মহানবী (স)-এর অন্তিম এ বাণী বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে অপরিসীম গুরুত্বের দাবিদার। এক কথায় তাঁর এ ভাষণকে মানবতার মুক্তি সনদ হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। রাসূলের অভিভাষণের সার্বিক দিক বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্বের সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি শান্তিময় ও সুন্দর হয়ে উঠত। রাসূলের ভাষণের ধ্বনি সেদিন মরুর হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি মুসলিম জাতির হৃদয়ে আজো চির জাগ্রত, চির অগ্নান।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.১০

#### নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বিদায় হজ্জের ভাষণের সময় সমবেত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল-

- |             |              |
|-------------|--------------|
| ক. লক্ষাধিক | খ. সহস্রাধিক |
| গ. শতাধিক   | ঘ. লক্ষ লক্ষ |

২. হযরত সে বিদায় হজ্জের ভাষণ দিয়াছিলেন-

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ক. মসজিদে নববীতে | খ. কা'বা গৃহে     |
| গ. মিনায়        | ঘ. আরাফাত ময়দানে |

৩. বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স) মানবজাতির সঠিক পথের দিশারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা-  
 ক. কুরআন ও হাদিস                      খ. ধর্ম ও বিজ্ঞান  
 গ. আরব জাতীয়তাবাদ                      ঘ. ইসলামি ফৌজদারি আইন।

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বিদায় হজ্জের ভাষণ কি এবং কখন দিয়েছিলেন?
২. মহানবী (স) বিদায় হজ্জের ভাষণের মূলকথা বর্ণনা করুন।
৩. মহানবীর (স) বিদায় হজ্জের ভাষণের গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

### বিশদ-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) এর মদিনার জীবনের প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পর্কে বিবরণ দিন।
২. মদিনা সনদ কি? মদিনা সনদের ধারা উল্লেখ কর ও এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৩. বদর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফলের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৪. উহুদ যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করুন এবং উহুদ যুদ্ধের ফলাফল নিরূপণ করুন।
৫. খন্দক যুদ্ধের কারণ উল্লেখ করুন এবং এ যুদ্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৬. হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তাবলী উল্লেখ করুন। এ সন্ধির গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।
৭. মক্কা বিজয় কারণ ও ঘটনা বর্ণনা করুন এবং মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৮. খায়বার যুদ্ধের বিবরণ ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৯. হুনাইনের যুদ্ধের বিবরণ দিন।
১০. তাবুক অভিযানের বর্ণনা দিন।
১১. মদিনার ইহুদিদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সম্পর্কে উল্লেখ করুন।
১২. মহানবী (স)-এর ইহুদি নীতির পর্যালোচনা করুন।
১৩. হযরত মুহাম্মদ (স) ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক ছিল আলোচনা করুন।
১৪. বিদায় হজ্জের ভাষণের বিষয় বস্তু উল্লেখ করুন এবং গুরুত্ব নিরূপণ করুন।

### উত্তরমালা

পাঠ ৩.১ :	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.ক	৫.খ
পাঠ ৩.২ :	১.খ	২.ক			
পাঠ ৩.৩ :	১.ক	২.খ	৩.গ	৪.ঘ	৫.গ
পাঠ ৩.৪ :	১.খ	২.ক	৩.ক	৪.ক	৪.গ
পাঠ ৩.৫ :	১.গ	২.গ	৩.গ	৪.খ	৫.ক
পাঠ ৩.৬ :	১.খ	২.গ	৩.গ		
পাঠ ৩.৭ :	১.ক	২.গ	৩.খ	৪.গ	
পাঠ ৩.৮ :	১.ক	২.খ	৩.ক	৪.গ	৫.খ    ৬.ক    ৭.খ
পাঠ ৩.৯ :	১.ক	২.খ	৩.ক	৪.খ	
পাঠ ১০. ১.ক	২.ঘ	৩.ক			